অজয়

অজয়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

২য় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৯. ১০. ৪৫

শ্রীমতী সুধারাণী দাস

করকমলেষু

Things never changed since the time of the Gods :
The Flow of Water and the Way of Love.

—Lafcadio Hearn

জন্মের আগে অন্ধকার, মৃত্যুর পরে অন্ধকার। মাঝখানে মানুষের জীবন। কত ক্ষুদ্র, কিন্তু কত বিচিত্র! অথচ অর্থহীন।

জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে সবটাই কি মানুষের জীবন? যেখানে স্রোতের অবসান, নদীর মৃত্যু সেইখানেই।

জীবন নিঃশেষ হইয়া আসে, স্রোত বন্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বেই মৃত্যুর ছেদ পড়ে।

নদী-কান্তার-গিরি-বন ভেদ করিয়া পথ চলিয়াছে। বহু মানব সেই পথে পা ফেলিয়াছে। তাহাদের ইতিহাস নাই। তবুও পথের ধূলায় তাহাদের চরণ-চিহ্ন অক্ষয় হইয়া আছে।

সেই চরণ-চিহ্নই মানুষের সত্য ইতিহাস।

ভুল-ভ্রান্তি, উত্থান-পতন, শান্তি-সংগ্রাম, জন্ম-মৃত্যু মানুষের পরিচয় নয়। হইলে, লক্ষ যুগের মৃত ও বিস্মৃত মানুষের কঙ্কালে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না।

মানুষের দীর্ঘশ্বাসও কোথাও সঞ্চিত নাই। মানুষ পথ হারাইয়াছে, পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, আবার পথ চলিয়াছে।

জীবনের খরস্রোতে ঘূর্ণাবর্ত্তের ইতিহাস রচনায় ফল কি? স্রোতই অক্ষয় হইয়া আছে।

আকাশে মেঘ ঘন হইয়া উঠে। বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে। বজ্র-গর্জ্জন প্রলয়ের আভাস দেয়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত। কিন্তু এ বিপর্য্যয় কতক্ষণের ?

'নির্ম্মল নীলাকাশ হাসিয়া উঠে। বুকে তারার মালা।

নদীজলে তাহারই প্রতিবিম্ব।

এক

ছোট্টখাট্ট চামচিকের মত ছেলেটি, সমস্ত দিন—ট্যাঁ-ট্যাঁ করিতে থাকে, ভাল করিয়া কান্নাও বাহির হয় না, চিত হইয়া আঙুল চোষে।

বাড়ে। জড়দেহে ধীরে ধীরে চৈতন্যের সঞ্চার হয়—অন্ধকারে আলোক-শতদল উন্মীলিত হয় যেন।

ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে, অন্য অনুভূতি নাই। উদরসর্ব্বস্ব পশু।

কিন্তু, ধীরে ধীরে—

শুধু ক্ষুধা নয়, আর-একটা নাম-না-জানা তীব্র অনুভূতি। ক্ষুধার চাইতেও উগ্র, কিন্তু স্বচ্ছ, নীল, গভীর।

বুদ্ধি। জানিবার ইচ্ছা।

অজ্ঞাত অপরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রশ্নে প্রশ্নে বাবা-মা অস্থির হইয়া উঠে।

আরও বড়। পাঠশালা।

কিন্তু পলাইয়া পলাইয়া ফেরে—পণ্ডিতকে সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না—মানুষ তো নয়, যেন চাবুক। সমপাঠীরাও যেন কি—গাদা-করা ঘুটিং কিংবা আর-কিছু। পায়ের আঘাতে

গড়াইয়া চলে। শুধু অমিয়,—বেশ ফুটফুটে চেহারা, যেন তন্বী কিশোরী—তাহার গলায় হাত জড়াইয়া বসিয়া থাকে, পড়া হয় না।

মার-ধোর—পাঠশালা যায় না। দুপুরে চৌধুরীবাড়ির পুঁই-মাচার তলায় বসিয়া চড়াইপাখীর খেলা দেখে। অমিয়র কথা মনে হয়—লঘু স্বচ্ছ মেঘ আকাশে জড়াজড়ি করিয়া ঘন হইয়া উঠে, আবার বাতাসে তফাত যায়।

শেষে মার কাছেই পড়া শুরু। 'হাসিখুসী,' 'প্রথম ভাগ' চটপট শেষ হয়। মার কাছে সুবোধ ছেলেটি, বুদ্ধি তো নয়, যেন করাত, সব কিছু কাটিয়া চলে। মা বলে, ওগো, দেখ। বাবা হাসে, কথা বলে না।

দুপুরে পাঠশালা নাই, মাও ঘুমায়। পুকুর-ঘাটের পৈঁঠায় গিয়া বসে। একটি দুটি করিয়া ঢিল ছোঁড়ে—জল তোলপাড়, কিন্তু সেদিকে নজর নাই। বুড়া বটগাছটার তলায় একটা ষাঁড় খোঁটায়-বাঁধা গাইয়ের গা চাটে, আগডালে বসিয়া দুইটা পায়রা ঠোঁট ঘষাঘষি করিতে থাকে—সেদিকেও নয়। মিস্ত্রীদের পরী ঝুড়ি করিয়া গোবর ও শুকনা ডালপালা কুড়াইতে আসে। জনাবালি গাড়োয়ান মোষ দুইটাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া পরীকে ইশারা করে—কি যেন বলে। পরী বুড়া আঙুল দেখায়।

মোষ দুইটি পুকুরের সবুজ জল ঘোলাইয়া তোলে, পাঁকে লুটোপুটি খায়। একটা পালক ঘূর্ণি হাওয়ায় উঠে নামে, ভাসিয়া বেড়ায়।

রোদে বাতাসে মাদকতা। জনাবালি পরীর কাছে যায়—হাসাহাসি, চাওয়া-চাওয়ি। শ্যাওড়া-গাছের তলায় জনাবালি বসে, পরী নত হইয়া শুকনা পাতা কুড়াইবার ভান করে। জনাব খপ করিয়া তাহার হাত ধরে—যে জায়গাটায় উল্কিতে একটা কলাগাছ আঁকা, সেই জায়গাটায়। পরী আঁকিয়া বাঁকিয়া পলাইতে চায়, কিন্তু পলায় না, জনাবালির দাড়ি ধরিয়া টান মারে, খিলখিল করিয়া হাসিয়া পা ছড়াইয়া কাছে বসে। জনাবালি কোঁচড় হইতে বাহির করিয়া পরীর হাতে দেয়—একটা আয়না, কাঁকই আর রেশমী-চুড়ি বুঝি—রসুলপুরের মেলায় কেনা।

পরী কি যেন বলে। সে শুনিতে পায় না।

বাতাস গরম ঠেকে, কান দুইটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে থাকে। আর কিছু দেখিতে চায় না। বেলা পড়িয়া আসে।

বাড়ি আসিয়া মার কাছে যাইতে চায়, কিন্তু পড়শীদের তখন ভিড়—ছোট-বড় কালো-সাদা মেয়ের মেলা।

জনাবালি—পরী—হাওয়ায়-ওড়া সেই পালকটা।—পুকুরের ঘোলাটে জল।

মিত্তিরদের ডলি, কোঁকড়া চুল—

ডলিকে ডাকিয়া দরদালানে লইয়া যায়।—পরীর উল্কি-পরা হাত। ছোটরাও পিছনে পিছনে আসে। আরব্য উপন্যাস পড়া হয় নাই—তবু হারুন-অল্‌-রসিদকে মনে পড়িয়া যায়।

মিষ্টি করিয়া ডাকে, ডলি! ডলি ছোট্ট করিয়া উত্তর দেয়, কি?

পরী আর জনাবালি।—

ইঁদুর-ছানা ভয়ে মরে,
ঈগল-পাখী পাছে ধরে।

ভয় করছে ডলি?

ডলি ঘাড় বাঁকাইয়া হাসে।—বুড়া বটগাছতলার শামলা গাই, চোখ বুজিয়া স্পর্শ অনুভব করে যেন।

'ছবির বই' খুলিয়া ডলিকে ছবি দেখাইতে বসে, অক্ষর-পরিচয় নাই, তবু সবই যেন ডলিকে বুঝাইতে পারে।

ডোজি আসিয়া হাঁকে, দিদি, মা ডাকছে, বাড়ি যেতে হবে। ডলি তার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলে, যাব না, যা।

কিন্তু পরক্ষণেই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কোকিলের ঠোঁট লাগিয়া যেন আমের মুকুল ঝরিয়া পড়ে। আগডালে পায়রা একা বসিয়া ঝিমায়।

'ছবির বই' ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। আকাশ গাঢ় নীল, রোদ যেন মায়ের স্পর্শ।

সামনের শুকিয়ে-আসা ডোবায় কাদা-জলে কতকগুলা বাঁশ পচে—ভুরভুরে পানসে গন্ধ। বোষ্টমদের রাধু পাড়ে বাসিয়া চার ফেলিয়া মাছ ধরে। জনাবালি—পরী।

পাড় দিয়া দল বাঁধিয়া ডলিরা যায়—হল্লা, চীৎকার। ডলি পিছন ফিরিয়া তাকায়, ডেজি তাহার আঁচল ধরিয়া টানে।

ফ্লোরেন্সের ব্রিজ নয়—কিন্তু বেয়াত্রিচে। দান্তের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ কালো হইয়া উঠে।

রাধু হাঁকে, হেই, চুপ, মাছ পালাল।

সব চুপচাপ—তবু মাছ পলায়।

পরী, ডলি, রেশমী চুড়ি—

পিছন হইতে মা ডাকে, খাবি আয়।

চমকিয়া উঠে, একটা দীর্ঘনিশ্বাসও বুঝি পড়ে—অন্ধকার অমাবস্যা-নিশীথের উল্কাপাত, কেই বা দেখে! মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, ডলি—। বলে ডলি, কিন্তু পরীকে মনে পড়ে।

অমিয়র কলম কাটিতে গিয়া আঙুলের যেখানটায় দাগ পড়িয়াছিল, সেইটে চোখে পড়ে। পণ্ডিত তো নয়, যেন ডাকাতের সর্দ্দার!

রাধু চলিয়া যায়, বাঁশগুলা পচে। এবার সোঁদা গন্ধ—ডলির চুল!

মা বলে, কি করেছে ডলি ?

ক্ষিদে পেয়েছে বড্ড। চল—খেতে দেবে।

'দ্বিতীয় ভাগ'। 'কথামালা'। 'পদ্যপাঠ'।

'কথা ও কাহিনী'—

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ, নারী-কণ্ঠের কাকলী,

মৃণাল-ভুজের ললিত-বিলাসে—

ডলি দলবল লইয়া আসে, কিন্তু পুকুর-ঘাট নয়, বাবার পড়ার ঘর। মৃণাল-ভুজ নয়, রজনীগন্ধার ডাঁটা।

দেওয়ালে একটা ক্লক-ঘড়ি। ম্যাডোনার শান্তস্নিগ্ধ মুখ—মা। 'মোনা লিসা'র অদ্ভুত হাসি, সাপের দৃষ্টি যেন—ডলি।

ডলিকে দেখায় একটা মিনিয়েচার বুদ্ধমূর্ত্তি।

সন্ন্যাসী।

তুমি সন্ন্যাসী হবে, কেমন ত্রিশূল নিয়ে বেড়াবে, জটা-পড়া চুল ?

হব, কিন্তু—

কানামাছি খেলবে দিদি ?—ডেজি হাঁকে। কিন্তু দাঁড়ায় না, ফিক করিয়া হাসিয়া আবার বাহির হইয়া যায়।

ডেজি ভারি দুষ্টু। বাতাসে-ভাসা সেই পালক।

ডলি বলে, আজ রাত্রে শনি-পূজো—

শনি কেন ?

অমনই। যেয়ো কিন্তু। আমি পেঁপের শরবত করব।

পেঁপের শরবত! যেন পাপিয়ার কণ্ঠস্বর, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের নিদ্রাভঙ্গে যেন এস্‌রাজের তারে মৃদু ঝঙ্কার, হয়তো স্বপ্ন।

শনি-পূজা—নিকানো উঠানে নয়, নেবুতলায়।

মা বলে, ডলি, সবাইকে ডাকলি না? ডলি কোথায় গেলি? ডেজি ছুটিয়া আসিয়া খবর দেয়। লক্ষ্মী ডেজি।

অন্ধকারে রঙ ধরিয়া উঠে, তারার জৌলুস—শুধু একটা অনুভূতি, যুগ-যুগসঞ্চিত একটা অন্ধ মিনতি—

নামহীন, রূপহীন, তবু মূর্ত্ত।

সাপ আর পাখী, বেড়াল আর ইঁদুর।

সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর। পুরাতন অথচ নূতন।

কিন্তু হইলে কি হয়, খেলা—অসীম কালের বক্ষে বুদ্বুদ।

পেঁপের শরবত বিস্বাদ, তেতো। ডলির হাতের তৈয়ারি, তবুও। তরমুজ যেন পচা মাংস!

একটা ব্যর্থ হাহাকার, শূন্যতা। মূক, বধির, অন্ধ।

বাবার পড়ার ঘরে আসিয়া বসে। ঝকঝকে বাঁধানো বইগুলি চোখের সামনে মাতালের উন্মাদ উলঙ্গ নৃত্য জুড়িয়া দেয়। দেখা যায় না, প্রাণ শুধু হাঁপাইয়া উঠে।

ছবির ফ্রেম যেন খালি, ম্যাডোনা ও মোনা লিসা তাণ্ডবে

যোগ দিয়াছে। ম্যাডোনার কোলের ছেলে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে—অনন্তকাল, বিশ্রামবিহীন। পাশের পেয়ারাগাছে বাহুড়ের ঝুটাপুটি। পাকা পেয়ারার বুক কাটিয়া যেন তাজা রক্ত ও কাঁচা মাংসের গেণ্ডুয়া খেলা হইতেছে। আকাশের হা-হা অট্টহাসি। ঝড় নয়, কান্না।

বৃষ্টি নামে। শুকনা পাতা ভিজিয়া যায়, গোবর মাটির সহিত মেশে। জনাবালি কাল আর মহিষগুলিকে স্নান করাইতে আনিবে না। পরীর রেশমী চুড়ি বুঝি ভাঙিয়াছে।

মা ডাকে, পেসাদ আনলি না রে? ক্রূর দেবতার অট্টহাসি অন্ধ চামচিকার মত কপালে ঠোকর দিয়া যায়।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায়, উঠিয়া বিছানায় বসে। দূরে শ্মশান-ঘাটে শৃগাল-সারমেয়ের চীৎকার, চীৎকার নয়, মধুর মৃদু আহ্বান—ডলি, ডলি, ডলি!

নিঝুম নিশীথিনী—রুদ্ধ শ্বাস। অন্ধকারে নিঃশব্দে বাহির হয়। আকাশে কে যেন কাদা লেপিয়া দিয়াছে, এতটুকু ছিদ্র নাই। বদ্ধ কারাগারে দম বন্ধ হইয়া আসে। পায়ের তলায় কর্দ্দমাক্ত পথ জড় মাংসপিণ্ডের মত ঠেকে, সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হয়।

অনন্তের পথে বিশ্বের অভিসার, ইতিহাস নাই, সাক্ষী নাই। অন্তরের বাষ্প জমাট বাঁধিয়া জল—মাটি—লোহা—পাথর। উত্তাপ—শীতল, হিম।

দূরে আলেয়া বুঝি? পৃথিবীও কি দিক ভুলিয়াছে?

ডলিদের বাড়িখানা রাক্ষসের মত বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়ায়, নিঃশেষে গ্রাস করিতে চায়। বেড়ার ধারে রক্তজবা রক্তচক্ষুর মত বোধ হয়।

রাক্ষস নয়, মায়ের কোল। ধীরে ধীরে বেড়ার উপর হাত বুলাইতে থাকে, বেড়ার গায়ে হাত রাখিয়া বার বার প্রদক্ষিণ করে—পৃথিবী। চোঁচে হাত কাটিয়া রক্ত ঝরে। উত্তাপ ধীরে ধীরে শীতল হয়।

স্বপ্নের ঘোরে ছেলে কাঁদিয়া উঠে বুঝি। নেশা কাটিয়া যায়। হাতের যন্ত্রণায় চোখে জল।

গ্রাম নয়, মরুভূমি। কাদা নয়, তপ্ত বালি। আকণ্ঠ তৃষ্ণা। জবাফুল ছিঁড়িয়া চিবায়।

আকাশের আবরণ ছিঁড়িয়াছে। একটি তারা, ডলি নয়।

ডেজি কি যেন একটা মজার স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া বসে; অন্ধকারে হাতড়াইয়া ডলিকে খুঁজিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়ে।

ডলি নিশ্চিন্তে ঘুমায়—উত্তপ্ত বাষ্প হিম হইয়া যায়।

দুই

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ।

অনেক রঙ ফিকা হইয়া আসিয়াছে, অনেক স্মৃতি অস্পষ্ট। সত্যকার অনুভূতি—ইন্দ্রজাল, স্বপ্নলব্ধ একটা আবছা মায়া যেন। ট্রেনে করিয়া পথ চলিতে চলিতে চলার নেশায় শহর-গ্রাম, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্ব্বত—সত্য হইয়াও সত্য নয়, চোখের উপর ক্ষণিকের মায়া বুলাইয়াই যেমন তাহারা মিলাইয়া যায়, এ যেন তেমনই।

বড় হইয়া, পড়িবার সময় অক্ষর-পরিচয়ের কথা মনে হয় না, কিন্তু তবু সেইগুলাই গোড়াকার কথা।

কঠিন প্রস্তরের মত যাহা বুকে চাপিয়াছিল, স্বচ্ছ মেঘের মত তাহাই এখন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়।

অতি বৃহৎ বিরাট ডলি ছোট হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহের সদ্যজাগ্রত কৈশোর বৃথা যায়। নিখিলের কণ্ঠে 'ডলি ডলি' আহ্বান অতি ক্ষীণ, শোনাই যায় না। পরী মরিয়াছে, জনাবালি কোথাও নাই, অমিয় কি ছিল?

পিতা বহু দূরে—মাও তাই, অকারণ একটা বন্ধন মাত্র। সুর কাটিয়া গিয়াছে।

রূপকথার রাজপুত্র স্বপ্নের ঘোরে রাজকন্যার ডাক শুনিয়া

সত্যকারের কণ্টকাকীর্ণ ধূলিমলিন পথে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এখন শুধু পথ আর পথ। দূরের সন্ধান চাই।

মনের মধ্যে এখন রামায়ণ, মহাভারত, রাজপুতকাহিনী, সিন্ধবাদ নাবিক, ইলিয়াড, অডিসির গল্প। মন যেন ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারি হাতে বাহির হইয়াছে—সামনেওয়ালা হুশিয়ার!

বইয়ের কীট। মা বকে, দিনরাত্তির অত পড়িস না রে, একটু খেলা কর্। বাপ সেই পুরাতন হাসি হাসে।

ছেলে তবু পড়ে। বলে, এই তো সব-চাইতে বড় খেলা মা, খণ্ড কালে নয়, খণ্ড দেশে নয়—নিখিল বিশ্বে, মহাকালের বুকে জীবিত ও মৃত সকলের সঙ্গে খেলা।

মা বোঝে না, খুশিতে চোখ জলে ভরিয়া যায়।

চোখে চশমা উঠিয়াছে; প্রত্যক্ষ এই একজোড়া চক্ষের বাহিরে আর একজোড়া চক্ষু যেন—শুধু মানস-লোকে নিত্য-নূতনের সন্ধান করা এই চোখের কাজ।

দুপুরে—রোদ, আলো, দমকা হাওয়া তেমনই আছে। চড়াই-পাখীর খেলার বিরাম নাই। স্বচ্ছ জল আজিও ঘোলাটে হয়; কপোত-দম্পতি অলস মধ্যাহ্নে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কূজন করে। হাওয়ায় পালক উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। জনাবালি আসে, পরীও—হয়তো অন্য নাম ধরিয়া। অপরাহ্নে মায়ের ঘরে

মেয়েদের ভিড়, কালো সাদা বড় ছোট সুন্দর কুৎসিত; কিন্তু—

নেশা একদম কাটিয়াছে। নিকট এখন বীভৎস।

শুধু বাবার পড়ার ঘরে ম্যাডোনার কোলের ছেলে যেন কোল ছাড়িয়া দূরে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। আর মোনা লিসাকে দেখে না। তাহার চোখে সে মাদকতা নাই, মুখের হাসি যেন নিরর্থক। শুধু মোনা লিসার পিছনে দূর দিগন্তকে স্পষ্ট দেখিতে পায়—আঁকা-বাঁকা দিগন্তপ্রসারিত পথ, পথের সাঁকো, নীল নদীজল, সবুজ পাহাড়—ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; শুধু অনন্ত অসীমের একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অকারণে কলম আর কাগজ লইয়া বসে। কথা কহিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়, হাঁপাইয়া উঠে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নয়, অনন্ত অনাগত কালের সঙ্গে।

লেখে।

প্রথমটা নিজের কাছেই অর্থহীন ঠেকে, এ কি অনাসৃষ্টি, পাগলামি! সহসা যেন দৃষ্টি খুলিয়া যায়। ভাবী কালের বুকে নিজেকে দেখিতে পায়, মহিমময় বিরাট মূর্ত্তিতে। অর্থহীন কথাই তখন রূপ-রসে ভরিয়া উঠে। বাবার পড়ার ঘরই রঙে ও সুষমায় অপরূপ।

পাশের ঘরে নিত্যকালের পর্ব্বত-দুহিতারা চঞ্চল চরণে ঘুরিয়া বেড়ায়। হাসি, গল্প, গানের টুকরা, কলধ্বনি, কানাকানি, কত কি! অনন্তকালের তপস্যা তাহাদের। কিন্তু ধ্যানরত মহাদেবের তপোভঙ্গ হয় না।

ডেজি ডলিকে টানিয়া দরজার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহার অটুট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া চঞ্চল চরণে ছুটিয়া পলায়। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত ডলি দাঁড়াইয়া থাকে, স্থির নিস্পন্দ।

ডলিকে ভিতরে ডাকে। সেই কণ্ঠ, সেই স্বর, কিন্তু এত শুষ্ক কেন?

ডলি ধীরপদে আসিয়া টেবিলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, দেওয়ালের ঘড়িটার টিকটিক কি তাহারই বুকের স্পন্দন?

ডলির দিকে মুখ না তুলিয়াই বলে, শোন—

আলসে আজি যে একেলা কাটাই বেলা,
হৃদয় ছাপিয়া কত কি যে মনে আসে,
মিথ্যা স্বপন মধুর ভুলের মেলা—
আশার আলোকে চমকে চিত্তাকাশে।

শুনিতে শুনিতে ডলির ক্ষুদ্র মাথা আনত হইয়া আসে, চোখের কোণে জল।

বাহিরিব আজি অচেনার অভিসারে,
গভীর আঁধার সেই বনপথ বাহি;

প্রেয়সী আমায় ডাকে আজ বারে বারে—
আঁধার রজনী কাটায় কি পথ চাহি ?

টপ করিয়া এক ফোঁটা জল তাহার হাতের উপর পড়ে। অবাক হইয়া ডলির মুখের পানে চাহিয়া বলে, ডলি, তুমি কাঁদছ ?

বিহ্বল ডলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠে, না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে !

ব্যথিত হইয়া বলে, আর একটু পড়ি—

বাতাসে ভাসিছে নিশ্বাস-পরিমল,
সে মধু সুরভি চিনাইবে পথ মোরে—

ডলি কাঁদিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়, দরজায় ডেজি দাঁড়াইয়া। ডেজি হাসিয়া বলে, অভিমান !

ডলি দাঁড়ায় না।

ডেজি তাহার পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া বলে, পড়, আমি শুনব। বলে আর হাসে মুখে কাপড় চাপা দিয়া।

কিন্তু পড়া হয় না। ডেজিকে তো সে চেনে না। নিখিলের বস্তুপ্রবাহের মাঝখানে অনাবিল কৌতুকের একটি কণা—হীরার মত উজ্জ্বল, কিন্তু ক্ষুরধার। ডেজিকে যেন বুঝিতে চায়, নিবিড় পরিচয়ের ব্যগ্রতা তাহার বুকে জাগে।

কিন্তু প্রবাহ—প্রবাহই। রঙ ধরাইয়াই ডেজি পলায়। দরজায় গলা বাড়াইয়া বলিয়া যায়, আর একদিন শুনব।

সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়। অচেনা রাজকন্যা, ভাবী কাল—সব। ডলির কান্না—উত্তপ্ত বালুকায় জলবিন্দু। কিন্তু ডেজির হাসি—খোঁচা হইয়া বুকে বেঁধে।

মোনা লিসার চোখ আবার ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। কাগজ কলম টান মারিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। 'আর একদিন শুনব'—কিন্তু প্রবাহ কি বাঁধা পড়ে?

সোজা মায়ের কাছে, মেয়েদের ভিড়ে। রঙ তুরুপ করিতে করিতে মা বলে, কি রে?

আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না?—কান্নার সুরে সবাই হাসিয়া উঠে। ম্লানমুখী ডলি নিবিষ্টচিত্তে তাসের ছবি দেখিতে থাকে। ডেজি কোথাও নাই।

বাধ্য হইয়া খাইতে হয়, কিন্তু খাওয়া ভাল লাগে না।

শ্যামল বনভূমিতে কি আবার আগুন লাগিল? রূপকথার রাজপুত্র, খোঁটায়-বাঁধা গরুর মত একটি খুঁটির চারিধারেই ঘুরিয়া ফেরে। বাবার পড়ার ঘরের চাইতে মায়ের খেলার ঘর মধুর ঠেকে। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। বেড়ার খোঁচায় হাত ক্ষত হয়।

দরজার পাশে হাস্যরত ডেজি। স্বপ্ন নয়, তবু দূর।

অনেক দিন লেখা হয় নাই। মন খেই হারাইয়াছে।

বিমানচারী পক্ষী ছিন্নপক্ষ হইয়া পাক খাইতে খাইতে ভূতলে পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখার খাতাখানা কোথায় গেল? এদিক সেদিক খুঁজিয়া বাবার পড়ার ঘর তোলপাড় করিয়া ফেলে, খাতা পাওয়া যায় না।

ডলির বুকের তলায় কালির লেখা চোখের জলে ঝাপসা হইয়া আসে। ডলি খাতাখানা চুরি করিয়াছে।

কিন্তু পড়িতে পারে নাই।

একদিন পড়ার ঘর হইতে শুনিল, মায়ের ঘরে ডেজির কলকণ্ঠ—

নীড় কহিছে, দূর তো নহে জানা,
অচিন্ সে পথ, কোথায় তার ঠিকানা?
দূর কহিছে, হেথায় নাই রে মানা,
অসীম এ বিস্তারে!—

চমকিয়া উঠে। সর্ব্বাঙ্গে মধুবৃষ্টি হয়। কান পাতিয়া থাকে, আর শোনে না। তাহার লেখা সার্থক—ডেজির কণ্ঠে সে কথা কহিয়াছে।

ডেজির কাছে গিয়া যেন রাগ দেখাইয়া বলে, আমার খাতা?

ডেজি হাসিয়া বলে, আমি কি জানি? ডলি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে।

রাগ করিয়া বলে, আচ্ছা, মজা টের পাবে।

ডেজি সুর করিয়া বলে—

সুনীল আকাশ ওই যে ওখানে
নামিয়াছে এই ধরণীর টানে,
নীলিমা যেখানে সবুজ হইয়া
মিশেছে সবুজ গায়ে—
ওইখানে মোর মন ছুটিয়াছে
আজিকে প্রভাত বায়ে।

যে লেখা ডলি বার বার পড়িয়াও বুঝিতে পারে নাই, ডেজির মুখে সেই লেখাই অপরূপ অর্থ বহন করিয়া আনে। ডলি অভিভূত হইয়া যায়।

বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে ডলি ধীরে ধীরে খাতাখানা বুকে লুকাইয়া রান্নাঘরে হাজির হয়। কয়লার উনান তখনও গনগন করিতেছে। খাতাখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসে, উনানের আলোতে কালির লেখায় যেন আগুন ধরিয়া যায়, কিন্তু চোখ ঝাপসা, আগুনে জলসেক হয়। তারপর ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্নেহে আপনার অশ্রুধৌত মহামূল্য রত্নখানি অগ্নিতে সমর্পণ করে। মা ছেলেকে আগুনে সঁপিয়া দেয়।

খাতা ধনুকের মত বাঁকিয়া ফুলিয়া উঠে। আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। ধারের আগুনে ভিতরের লেখা স্পষ্ট পড়া যায়, কিন্তু তখন আর উপায় নাই।

সাদা ধীরে ধীরে কালো হয়, কালো সাদা হইয়া জ্বলজ্বল করিতে থাকে। খাতায় চোখের জলের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু ডলির চোখে বান ডাকিয়াছে।

ডলির বোধশক্তিও কি অকস্মাৎ চতুর্গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল? কত বিনিদ্র নিশীথের তপস্যায় যাহা অবোধ্য ছিল, আজ তাহাই—

অসীম শূন্যে কে ধরাল রঙ—
আমিই সে কি?

তাহার মনের রঙেই আজ সব রঙ ধরিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ডেজি ছুটিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, এবং নিমেষমধ্যে জ্বলন্ত উনানে হাত ভরিয়া দিয়া খাতাটা টানিয়া তোলে, ছাই-গুলা গুঁড়া গুঁড়া হইয়া চোখের সম্মুখে নৃত্য জুড়িয়া দেয়। পোড়া হাতে ব্যথা অনুভব হয় না।

হতাশভাবে কাঁদিয়া ডেজি বলে, এ কি করলে দিদি? ডেজি কাঁদে।

কিন্তু ডলির চোখে তখন জল নাই।

পাঠশালা স্কুল করা হয় নাই, কিন্তু পুঁথির সমুদ্রে কিলবিল করিয়া ফিরিয়াছে।—অনন্তের পথে যাত্রা করিবার জন্য পুত্রকে পিতার এই দান, কিন্তু অগোচরে। এই ছোট্ট পড়ার ঘরে পিতা ও পুত্রের মিলন হয়। সাক্ষাতে নয়, তৃতীয় আর কাহাকেও

মধ্যস্থ রাখিয়া। অসীম মহাকাল শুধু সেই ইতিহাস জানে। পিতা মনের ক্ষুধা মিটায়।

মা দেখে শরীর। প'ড়ে প'ড়ে শরীর গেল যে! খাবার সময় পর্য্যন্ত নেই!

কিন্তু তরী তখন তীরের বাঁধন কাটিয়া অসীম সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে। কূলে দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করা ছাড়া উপায় নাই। অসহায় নারী!

ডলি ডুবিয়াছে। কিন্তু এ কি ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল ডেজি? ইহারই চতুর্দ্দিকে কি পাক খাইয়া মরিতে হইবে?

মোনা লিসার বুকের খাঁজটুকুতেই মন ডুবিয়া যায়—কপালের দাগ।

লেখায় নেশা জমে না।

শান্ত মধ্যাহ্নে ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া বই লইয়া বসে, অর্থহীন অক্ষরগুলা চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু কথা বলে, ডেজি ডেজি ডেজি!

হঠাৎ একটা পাকা করমচা বুকে আসিয়া আঘাত করে, জামায় ঘোর লালের ছোপ—রক্ত যেন। আর একটা—আর একটা। উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে চায়, করমচাগাছের তলা হইতে কে যেন ছুটিয়া দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া

দাঁড়ায়—কাপড়ের আঁচলটুকু দেখা যায় শুধু, চুড়ির রিনিঝিনিও শোনা যায়।

হঠাৎ কপাল ঘামিয়া উঠে, বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে থাকে। শৈশব-মধ্যাহ্নের কথা চকিতে মনে পড়ে—স্পষ্ট।

ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। ডেজি আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কৌতুক-হাস্যে তাহার দেহ তরঙ্গায়িত হইতেছে।

ডাকে, ডেজি! নিজের কাছেই নিজের স্বর অস্বাভাবিক ঠেকে। ডেজি উত্তর দেয় না। মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া লয়, মুখের হাসি তখন মিলাইয়াছে, কৌতুকের চিহ্ন নাই। ডেজি কি কাঁপিতেছে?

কাছে গিয়া ডেজির হাতখানা চাপিয়া ধরে। ডেজি বাধা দেয় না। শুধু আর একখানা হাত প্রসারিত করিয়া দূরের কাঁঠালগাছটা দেখায়। ডলি তাহার তলায় বসিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতেছে, যেন কিছুই সে দেখে নাই।

বলে, ভেতরে এস না ডেজি।

মৃদুস্বরে ডেজি বলে, কেন? একটু থামিয়া জোরে বলে, দিদিকে ডাকি। ডাকে, দিদি!

ডলি মুখ তুলিয়া চায়! শুষ্ক ধূলির উপর চোখের জল।

ডলি দাঁড়ায় না, বাগানের ভাঙা বেড়া টপকাইয়া গলি পার হইয়া চলিয়া যায়।

ডেজিকে হাত ধরিয়া পড়ার ঘরে আনিয়া বসায়। মাটিতে চোখ নামাইয়া ডেজি বলে, তোমার লেখা পড় না!

ছাই লেখা! অর্থহীন, সুরহীন, ছন্দহীন।

ডেজির হাসিতে সুর, হাতের চুড়িতে ছন্দ, আর সমস্ত দেহের তরঙ্গে একটা অর্থ।

•

ডেজির হাতটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, ডেজি!

ডেজি ক্ষণকাল নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে, চোখও বুজিয়া আসে যেন।

হাতের তালুর উল্টা পিঠে একটা চুম্বন। দুইটি দেহে অবিরাম বিদ্যুৎ-প্রবাহ।

বিদ্যুতাহত ডেজি উঠিয়া দাঁড়ায়। ডাকে, দিদি, ভেতরে এস না! লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙা। জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ডলি সমস্তই দেখিয়াছে।

ডলির হাত ধরিয়া ডেজি চলিয়া যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রিমঝিম করিতে থাকে। বুকের কাছে করমচা-ছ্যাঁচার দাগ—

তাজা রক্তের মত দগদগে মনে হয়, মনের ভিতরটা টনটন করিয়া উঠে।

ঈজিচেয়ারের উপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসিয়া দেহটা আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ডলি আর ডেজি কয়দিন আসে নাই।

সে আবার পড়ার ঘরে ডুব দিয়াছে। ডেজি লেখা শুনিতে চাহিয়াছিল, লেখার বিরাম নাই। কি লিখিতেছে, কেন লিখিতেছে, সে জানে না।

কিন্তু খাতা ভরিয়া যায়।

খাতাখানি হাতে লইয়া বাহির হইতেই মা বলে, শুনেছিস রে, ডেজির খুব অসুখ!

অসুখ? খাতাখানা হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়।

কি অসুখ মা?

টাইফয়েড জ্বর, শহর থেকে ডাক্তার এসেছিল।

হায় রে, সে এ কয়দিন কোন্ স্বপ্নলোকে বাস করিতেছিল?

খাতা মাটিতে পড়িয়া থাকে। ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

ডলি শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে, মা পায়ের কাছে বসিয়া।

ডেজি প্রলাপ বকে—দূর! পাকা করমচায় নাকি আবার লাগে? তুমি বুঝতে পারছ না দিদি—

ডলি রাঙা হইয়া উঠে। জামাটার বুকের কাছে করমচার দাগ ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

কই, তোমার লেখা পড়লে না? দিদি শোনে না। আমি তো শুনি।

মায়ের অশ্রু-সজল চোখ। ডাকে, ডেজি, মা আমার! তোকে কে দেখতে এসেছে দেখ্।

খাতাখানা পুড়িয়ে দিলে কেন দিদি? আমি কক্ষনো চুরি ক'রে আর পড়তাম না।

ডলি আর কান্না রোধ করিতে পারে না, ডেজির বালিশের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে।

সে বলে, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে আসছি, রাত্রে এখানেই থাকব।

বাড়ি আসিয়া খাতাখানা খুঁজিয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়।

তারপর, মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ।

মরণোন্মুখের প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে জীবিতের প্রতি অন্যায় করে সম্ভবত। কিন্তু হাতে সময় বেশি নাই।

বোনের মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ডলি একটা অকথিত সুখ অনুভব করিয়া পীড়িত হয়। সে অনেক রাত জাগিয়াছে। কিন্তু কেহ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে পৃথিবীর সব-চাইতে প্রিয় বস্তু দূরে মিলাইতে থাকে, কিন্তু এ দূর মধুর নয়, ভাষাহীন কঠোর, অন্ধ অন্ধকার।

প্রথম খাতাখানি ডলি চুরি করিয়া পোড়াইয়াছিল, দ্বিতীয়-খানি স্বেচ্ছায় সে ডেজির জ্বলন্ত চিতায় সঁপিয়া দিল। কি তাহাতে ছিল, পৃথিবীর কেহ জানিল না, যে লিখিল সেও না।

মৃত্যুর পরপারে পড়িবার ও মুখস্থ করিবার ইচ্ছা কি থাকে?

জামায় করমচার দাগের চিহ্নমাত্র নাই। শান্ত দ্বিপ্রহরে ডেজির হাতের চুম্বন-চিহ্ন ডলির বুকে জ্বলজ্বল করিতে থাকে।

তিন

শ্মশানের শুষ্ক বালুর উপর ফসল গজায় না।

কিন্তু বর্ষার প্লাবনে নির্ম্মম বালুকার বুকে যখন নদীর আবিল আবর্ত্ত পলিমাটি বিছায়—

এক বৎসর, দুই বৎসর—

তখন শ্মশানের চিহ্ন থাকে না। শুষ্ক বালু প্রাণ-স্পন্দিত হয়। শ্যামল শস্যে তীরভূমি হাসিয়া উঠে।

পলিমাটির তলায় ডেজি চাপা পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ডলিও। ডলির প্রেতমূর্ত্তি যেন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ফেরে।

কখনও কি পরিচয় ছিল?

অনেক দিন ডলিকে দেখে নাই। মায়ের কাছে, পড়শীদের মুখে ডলির বিবাহের খবর শোনে।

বাবা ফরাসী ভাষায় হাতেখড়ি দিয়াছেন অনেক দিন। ফরাসী সাহিত্যের উন্মাদনার তলে সে খবরটাও চাপা পড়ে।

পাস্কাল, আনাতোল ফ্রাঁস, রেনাঁ। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজী কাব্যসাহিত্য।

ভোর হইতেই সানাই বাজিতেছে, অতি করুণ সুর। পড়ার ঘরের কারাগারে যেন ফাটল দিয়া বাহিরের স্বর্ণাভ আলো আচমকা প্রবেশ করে, পাষাণ প্রস্তরের বুক চিরিয়া সহসা নির্ঝরিণী বহিয়া যায়।

কিন্তু সে নিমেষের জন্য।

রন্ধ্র-পথ রুদ্ধ হয়, প্রস্তরস্তূপ শুষ্ক, কঠিন।

কিন্তু দিনের আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন মন আবার গলিতে থাকে। সানাই আরও করুণ হেঁকে। সমস্ত বিশ্ব কি কান্না জুড়িয়া দিয়াছে?

সজ্জাভরণভূষিতা বিনম্রা ডলি ঠিক বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বে ধীর পদক্ষেপে মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যার মত আসে।

সে গালে হাত দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া। সানাই তাহাকে উদাস করিয়াছে।—অসীম অজানা পথের পাথেয় এই সুর, কিন্তু এ যে নির্ম্মম বন্ধন!

এক জোড়া হাত পায়ে ঠেকিতেই চমকিয়া উঠে। মোনালিসার হাসি কি ক্রূর!

কে, ডলি?

একটা সাদা খাম তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে ডলি বলে, ডেজি মরার আগে নিজের হাতে এই চুলের গোছাটা কেটে রেখে ব'লে গেছে, তোমায় দিতে। এতদিন পারি নি। আজ দিলাম।

খসখসে কাগজই ভেলভেটের মতন নরম ঠেকে। একখানি পাণ্ডুর মুখ মনে পড়িয়া যায়।

ডলি, ওরা তোমায় নিয়ে যাবে কবে?

পরশু সকালে।

আমাদের মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ।

আর একবার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ডলি চলিয়া যায়।

সানাই এবার মধুর। খামের ভিতর হইতে অতি সন্তর্পণে চুলের গোছা বাহির করে—এক টুকরা সাদা কাগজের উপর কুণ্ডলী করা, পিন দিয়া আঁটা—শয্যায় শায়িত রোগশীর্ণ দেহ যেন। ধীরে ধীরে মুখের কাছ পর্য্যন্ত লইয়া যায়, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারে না।

স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। ডলিদের বাড়ি যাওয়া হয় না।

অন্ধকার আকাশ উলুধ্বনিতে মুখর। ডলির সম্প্রদান হইয়া গেল বুঝি।

চুলের গোছার উপর আঙুল বুলাইতে থাকে। মৃত্যু-পরপারের ডেজিকে স্মরণ করিয়া কাঁপিয়া উঠে—দ্বিপ্রহরের একটি চুম্বন।

চুল কিন্তু ডেজির নয়, ডলির।

শুভদৃষ্টির সময় ডলি আয়ত চক্ষু মেলিয়া চায়; তুষার তখন গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দৃষ্টি ঝাপসা, শুধু একটা কালো ছায়া।

সঙ্গীহীন মন। অনাবিষ্কৃত বিশ্বের সঙ্গে নূতন পরিচয় একজন সাথী রাখিয়া করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সঙ্গী গড়িয়া তুলিবার অবকাশ পায় নাই। পড়ার ঘরের চিরবন্দী সঙ্গীদল নীরস কঠোর, হাসিতে পর্য্যন্ত জানে না। গভীর গাঢ় চোখ মেলিয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, নেশা জমাইতে পারে না।

নাপিতদের নফরকে ডাকিয়া কথা কয়। নফরের নিকট সব অবোধ্য হেঁয়ালি।

বাবুর ভয়ে নফর পলাইতে পারে না, চুপ করিয়া থাকে।

নফরকে পড়াইতে বসে, গড়িয়া তুলিতে চায়, নিজের কথার প্রতিধ্বনি তাহার মুখে শুনিবার জন্য মন উৎসুক; কিন্তু পিতলের কলসীর ভয়ে মাটির হাঁড়ি জরজর। নানা অছিলায় নফর চলিয়া যাইতে চাহে।

এতদিন যে নিঃসঙ্গ স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ,—অন্ধকার পথে আর একজনের হাতের স্পর্শ, একটা সত্যকার অনুভূতির জন্য মন ব্যাকুল।

যে পথ আজিও নিজের অজানা, সেই পথেই আর একজনকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রামে সঙ্গী মেলে না। ·

মন হাঁপাইয়া উঠে। পড়ার ঘর যেন অন্ধকূপ। মোনা লিসা যেন প্রাণহীন আলেখ্য মাত্র।

ভোরে বাহির হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া স্টেশনের পথে বাঁধানো সাঁকোর উপর গিয়া বসে, ভারমন্থর গরুর গাড়ি রাঙা ধূলা উড়াইয়া হাটের কিংবা স্টেশনের পথে চলিয়াছে, তৈলহীন চাকার অপরূপ ঐকতান-সঙ্গীত মনকে উদাস করে। বোঝা-মাথায় সাঁওতাল-মেয়েরা আপনাদের দেহের ছন্দে আপনারাই মুগ্ধ হইয়া হাস্যকোলাহল ও গান করিতে করিতে পথ চলে, সমস্ত ধরণী যেন তাহাদেরই আনন্দের রসদ যোগাইতেছে, এমনই তাহাদের জোর। আশেপাশে গ্রামের শীর্ণকায় পথিকেরা ক্লান্ত চরণে বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছে। সাঁকোর নীচে বাঁধের কাদায় এক জোড়া মহিষ গা ছাড়িয়া বসিয়া, পিঠে এক-একটা কাক নিঃশঙ্কচিত্তে কা-কা করিতেছে। দূরে মাঠের আলে আলে পথিকেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করিতেছে।

একটা নিদারুণ অজানিত দুঃখ বুকে চাপিয়া বসে, অকারণে গান গাহিয়া উঠে, কাক দুইটা উড়িয়া যায়।

একজন পথিককে ডাকিয়া কথা কহিতে চায়, ছোট্ট দুই-একটা জবাব দিয়া পথিক আবার পথ চলে।

কাঁকর-বিছানো লাল পথ ধূসর হইয়া দিগন্তে মেশে, কত দূরে ?

দ্বিপ্রহর আরও ভয়ঙ্কর। দেহ উত্তপ্ত, নীড়হারা পাখীর মত মন ক্লান্ত। সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া একটা চাপা হাসি যেন তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। খররৌদ্র তাহার চিত্তকেও দগ্ধ করে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রোদে ছুটাছুটি করিয়া ফেরে, ঝাঁকড়া বট-গাছের ডালে দোল খায়, কোলাহল করে। তাহাদের জন্য অকারণে ব্যথিত হইয়া উঠে।

শুষ্ক শিমুলফুল ফাটিয়া চারিদিকে তূলা উড়িতে থাকে, জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখে। চারিদিকে গুচ্ছ গুচ্ছ কুরচি আর সোঁদাল ফুল ফুটিয়া আছে। কুরচির গন্ধ কি বীভৎস, তীব্র! সোঁদালফুল যেন চিতার আগুন।

ডোবার ধারে কাঠচাঁপার গাছ জল ছুঁইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর গিয়া বসে। বোষ্টমদের রাধুর মাছ-ধরা আজিও শেষ হয়

নাই। বামুনদের বিধবা মেয়ে হারাণী বাসন মাজিতে আসিয়া অকারণে জল ছিটায়।

রাধু গাল দিতে যায়, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কিছু বলিতে পারে না।

ঝকঝকে বাসন লইয়া শুকনা মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ রাখিয়া হারাণী চলিয়া যায়।

মায়ের ঘরে মেয়েদের কলহাস্য কি কুৎসিত! উহাদের কি আর কিছুই করিবার নাই?

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মনের তিক্ততা দূর হইয়া যায়। মন উদাস হয়। জনহীন মাঠে বসিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। মন তখন যেন আপনার ভাষা খুঁজিয়া পায়, অনন্ত আকাশের সঙ্গে কথা কয়। অসীম তারারাজ্য, স্বচ্ছ ছায়াপথ। দূরের ডাক স্পষ্ট হইয়া উঠে।

বাহির হইতেই হইবে, জয় করিতেই হইবে। খাতার সাদা পাতা কালো হইতে থাকে।

বাবা কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে। বাবাকে কথা বলিতে গিয়া বিব্রত হইয়া উঠে। নিজের উপর রাগ হয়, কোনও রকমে বলিয়া ফেলে, বাবা, আমি কলকাতা যাব।

চৌকাঠের উপর বসিয়া মা পান সাজিতেছে, ছেলের মুখের পানে চাহিয়া বলে, কলকাতা কেন রে?

আমি পড়ব।

বাবা শুধু বলে, আচ্ছা।

মায়ের বাপের বাড়ি কলিকাতা, বাপের বাড়ির কথা স্মরণ করিয়া মাও খুশি হয়। ছেলে পাস করুক।

বাধ্য হইয়া কলিকাতায় যাইতে হয়, বিধবা মাকে সঙ্গে লইয়া। হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ বাবার মৃত্যু হইল। সেই দীর্ঘায়ত দেহ, শান্ত স্থির মুখখানি চিরদিনের জন্য সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল।

গ্রামের সম্পত্তির ভার দূর-সম্পর্কের খুড়ার হাতে দিয়া রোরুদ্যমান মায়ের হাত ধরিয়া ছেলে যখন গরুর গাড়িতে উঠিল, তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। গাড়ির চারিপাশে মেয়ে-পুরুষের ভিড়, মা ও ছেলেকে সকলে বিদায় দিতে আসিয়াছে। সংক্রামক রোগের মত কান্না ছড়াইয়া পড়ে। সকলের চোখেই জল।

ডলি গতরাত্রে শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছে। জনতার এক পাশে সঙ্কুচিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া; তাহার চোখে জল নাই। ডলি স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চায়। সে জামার পকেট হইতে সেই খসখসে খামখানি বাহির করিয়া দুই হাতের তালুতে চাপিয়া ধরে, সেটি আর সাদা নাই। ডলিকে কাছে ডাকিয়া শেষ বিদায় লইবার জন্য মন হুহু করে। বুক হইতে যেন একটা

অসহ্য ভার কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে, ডলিকে কাছে ডাকিতে পারে না।

কান্নাকাটি হা-হুতাশ, চিঠি-পত্রের জন্য অনুরোধ মিনতি। গাড়োয়ান গরুর লেজ মলিয়া দেয়। প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বালির উপর ঘসঘস করিয়া দাগ কাটিয়া সোজা গাড়ি চলিতে থাকে। মোনা লিসা ও ম্যাডোনার ছবি সামনের সুটকেসের উপর কাপড় মোড়া। পিছনের গাড়িতে বাপের অমূল্য সম্পত্তি বইগুলি, কতক পুত্রের অধিগত, অনেকগুলি এখনও অধিকারে আসিতে বাকি আছে।

দল বাঁধিয়া যে সকল প্রবীণ ও শিশুর দল গাড়ির সঙ্গ লইয়াছিল, তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকে। নূতন পুকুরের বাঁকে ফলসাগাছের কাছে গাড়ি আসিতেই ডলিকে দেখিতে পায়, বিবাহ-রাত্রির সেই বেশ! অপূর্ব্ব শান্তশ্রী, কিন্তু তীব্র দৃষ্টি তাহার চোখে; বিদায়-বেলায় অশ্রুর চিহ্নমাত্র নাই, গভীর অতল-স্পর্শ চক্ষু হইতে একটা জ্বালার আভাস পাওয়া যায়। ডলি কি নূতন হইয়া আসিল?

মা বলেন, ডলি, মা, তুমি একলা এতটা এসেছ কেন?

গাড়োয়ান গাড়ি থামায়। ডলি কথা বলে না, ধীর পদে কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া মায়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করে। শান্তকণ্ঠে তাহাকে বলে, ডেজির চুলগুলো আমার কাছে রাখতে ইচ্ছা হয়, আমায় দেবে?

সামনের দিক হইতে ডলিকে গাড়ির পিছনের দিকে সে ডাকে ; বলে, সত্যিই তুমি চাও ডলি ?

হ্যাঁ, আমি যত্ন ক'রে রাখব।

অর্দ্ধেক তোমায় দিই, অর্দ্ধেক আমার কাছে থাক্।

ডলির চোখ জ্বালা করিয়া উঠে, আয়ত চোখ মেলিয়া বলে, তাই দাও।

পিনে আঁটা চুল দুই ভাগ হয়। ডলি চুলের ছোট্ট গোছাটি শক্ত করিয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মায়ের অলক্ষ্যে তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করে।

খামখানি বুকের পকেটে রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, ডলি, আবার যদি কখনও দেখা হয়, আমাদের চিনতে পারবে তো ?

হ্যাঁ, পারব।—বলিয়া ডলি আর একবার তাহার মুখের পানে চায়।

গাড়ি ছাড়িয়া দেয়।

হাতের মুঠির মধ্যে নিজেরই চুলের গোছায় যেন আগুন ধরিয়া যায়, অসহ্য দাহ। ডেজির মরা মুখখানি স্মরণ হয়।

গাড়ি মোড় ফেরে।

শ্মশান-ঘাটের পাশ দিয়া স্টেশনে যাইবার পথ।

দূরের শীর্ণ নদী প্রভাত-সূর্য্যকরে ঝলকিয়া উঠে, যেন ইস্পাতের পাত। প্রভাত হইলেও শ্মশান—শ্মশান।

জায়গাটা ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু অগ্নিশিখায় ঝলসানো দেহখানা মনে পড়ে, বুকের ভিতরের খাম হইতে যেন সেদিনের পোড়া চুলের গন্ধ আসে।

পুরাতন চিতার তলায় পিতার নূতন চিতা চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু মায়ের চোখে জল।

নদী পার হইয়া গাড়ি চলিয়া যায়। বিস্তীর্ণ বালুকার মধ্যে শ্মশান-ঘাট অন্তর্হিত হইয়া যায়, শুধু ভাঙা কালো কলসীগুলা যেন মাথা উঁচু করিয়া তাহাদিগকে শেষ দেখা দেখিয়া লয়।

মায়ের কান্না যখন থামে, ছেলে তখন মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠে।

পিছনের গাড়িতে বসিয়া পুরাতন ভৃত্য হারু হুঁকা টানিবার অবকাশে গান ধরে—

কারো দোষ নয় মা তারা—

ডলি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পরিত্যক্ত ঘরের সর্ব্বত্র যেন গুপ্তধন খুঁজিয়া ফিরিতেছিল।

কলিকাতায় মামার বাড়ির একটি কুঠরিতে বাবার বইগুলি স্থান পাইয়াছে, ম্যাডোনা ও মোনা লিসার ছবিও।

মায়ের নিরাভরণ দেহ তাহাকে দূরের সন্ধান দেয়, একটা অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র। অবিশ্বাসী মন সেটাকে ঠেলিয়া রাখিয়া বই লইয়া বসে। পুরাতন কথা, নূতনত্ব নাই।

এত বড় ছেলে, একটাও পাস দেয় নাই, ব্যাপারটা যেন সকলের চোখে এই নূতন ধরা পড়িল। খাবে কি ক'রে? যে দিনকাল!

মায়ের মুখ চাহিয়া পাস দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, খাওয়ার নয়।

আসিয়াই পুথি-সমুদ্রে ডুব দিল, তাই আলাপ কাহারও সহিত জমিল না। সকলেই বলে, কি গেঁয়ো ছেলে গো! দিন-রাত্তির বই লইয়াই আছে!

মামাতো বোনেরা পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দরজার কাছ হইতে গলা বাড়াইয়া এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিয়া যায়, পাড়ার সঙ্গিনীরাও দেখে।

চুলের মৃদু গন্ধ, শাড়ির খসখস আওয়াজ, চুড়ির রিনিঝিনি, চাপা হাসি, কলহাস্য ও দ্রুত পদশব্দ অতীতের বহু চিত্র সম্মুখে টানিয়া আনে—

করমচা পাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আকাশ ধোঁয়ায় কালো, বাতাসে দুর্গন্ধ। চোখ কি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে? সে নীল কোথায় গেল?

ঘোর অন্ধকার রাত্রে গাঁয়ের সহিত শহরের যেন একটা যোগ ঘটিয়া যায়। সেই তারা, সেই উল্কাপাত!

কিন্তু খাতা আর খোলা হয় না।

নীরস কঠোর পাঠ্য বইগুলি অনন্ত চিন্তারাজ্যের পথে কবন্ধের মত বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়ায়; নদীর স্রোত-জল শুকাইয়া ডোবার সৃষ্টি করে।

সমস্ত দিন বাহিরের ঘরে কাটাইয়া রাত্রির অন্ধকারে যখন মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বিশ্বের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত কঠোরতা অভাব-অভিযোগ এক নিমিষে লুপ্ত হয়। বাবার প্রশান্ত হাস্যদীপ্ত মুখখানি যেন অন্ধকারের পরপার হইতে ভাষা-হীন আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, ডলির শিশু-বয়সের ভয়কাতর ব্যাকুল মুখখানি বুকে জাগে, ডেজি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়ায়, চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন গ্রামখানি সমস্ত রূপ রস মোহ মায়া লইয়া মনের মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠে।

মা তাঁহার পাগল ছেলেকে বুকে টানিয়া লয়, চোখের জলে রাজপুত্রের অভিষেক হয়। ছেলের চুল আঘ্রাণ করিয়া মা বলে, রাত অনেক হ'ল, ঘুমোগে যা।

নিজের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতেই একটা জীবন্ত স্পর্শ যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরে, একটা অতি পরিচিত গন্ধ তাহাকে উদাস করিয়া দেয়, অন্ধকার যেন রূপ ধরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি নাই, অন্ধ। গাঁয়ের পড়ার ঘর স্মরণ হয়, পরিচিত গন্ধ সেই ঘরের।

ইলেকট্রিক আলো জ্বালিতে ইচ্ছা করে না। দেশলাই জ্বালাইয়া মোনা লিসার ছবি দেখে, প্রাণহীন ছবিখানা অন্ধকারে প্রাণ ফিরিয়া পাইল বুঝি!

অন্ধকার বিছানায় শুইয়া আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, নীল সমুদ্রের কল্লোল কানে শুনিতে পায়, দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ, তুষার-ধবল পর্ব্বতচূড়া, রঙ ও মেঘে বিচিত্র অসীম আকাশ।

কলিকাতার সমস্ত কোলাহল-আবিলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিঃসঙ্গ প্রান্তরে সে বাস করিতেছে।

একটা পরীক্ষা হইয়া গেল।

কলহাস্য, কৌতুকচঞ্চল পদধ্বনি থামিয়াছে। দরজার চৌকাঠ অবধি আসিয়া যাহারা বিদায় লইত, চৌকাঠ ডিঙাইয়া তাহারা ভিতরে আসিতে শুরু করিয়াছে; কিন্তু স্বপ্নলোকে ধ্যানরত পুরুষটির নাগাল পায় নাই।

তরঙ্গ তবু মূক বধির তটকে আঘাত করিতে ছাড়ে না।

পরীক্ষা তো হ'য়ে গেল, আবার পড়া কেন?

বই হইতে মুখ তুলিতেই চোখে পড়িল শীর্ণ একখানি মুখ, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর; নিজের পিঠের চুল সামনে টানিয়া আনিয়া তাহা লইয়াই খেলা করিতেছে।

মামাতো বোনেরা অবাক হইয়া মেয়েটির মুখের পানে চায়, ধন্যি সাহস রেণুর।

জবাব দেয়, সময় তো কাটাতে হবে!

কেন, বেড়াতে যাও না, খেলা কর না! আমাদের নিয়ে বায়োস্কোপে যাবে আজ? চল না!

মামাতো বোন শোভা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল দাদা, আমি মাকে বলি গিয়ে।

শোভা ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে করুণা-সুষীও।

·

বলে, তোমারই নাম রেণু? ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি। রেণু বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া বলে, কেন?

শোভার বন্ধুদের দেখি, কিন্তু কারও নাম জানি না কিনা!

তাই বুঝি? হাসলে কেন?

ডেজির সঙ্গে মেয়েটির কোথায় যেন মিল আছে। কথা বলার ভঙ্গীতেই বুঝি।

·

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলে, তোমার অরুদা কে?

অরুদা?

চট করিয়া মনে পড়িয়া যায়। দূর, সে আমার দাদা হবে কেন? ওই সামনের বাড়িতে থাকে, কলেজে পড়ে।

রক্তহীন পাণ্ডুর মুখেও লালের আভাস।

তোমার একটা চিঠি পথ ভুল ক'রে আমার কাছে এসে পড়েছে।

সে উঠিয়া দাঁড়ায়, দেওয়ালের উপর ফুলহীন ফুলদানির ভিতর হইতে পুঁটুলি-করা একটা কাগজ বাহির করিয়া রেণুর হাতে দিতে যায়।

রেণু বলে, থাক্, ও আমি দেখতে চাই নে।

নেশা তবে কাটিয়াছে।

শোভা দলবল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলে, তাই ঠিক হ'ল, আজ বিকেলে। মা তোমায় ডাকছে, চল।

ভিতরে যাইতেই মামীমা বলেন, আজ সাত মাস এসেছিস! এই প্রথম বুঝি তোর সময় হ'ল? অমন আপ্তসুখী হওয়া ভাল না। ভাইবোনদের নিয়ে একটু-আধটু খেলা-ধুলোও করতে হয়।

কলিকাতাতেও গাছের পাতা সবুজ, আকাশ নীল, মেঘে মাদকতা।

তারপর, গল্পগুজব, হাসি-খেলা, বায়োস্কোপ, মাঠ, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম।

দল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বইগুলিতে ধূলা পড়ে। শাড়ির রঙ, পাড় পর্য্যন্ত চেনা হইয়া যায়।

মায়ের কাছে অকস্মাৎ ডলির চিঠি। নিজের ছাড়া গাঁয়ের সকলকার খবর পাঠাইয়াছে।

ডলির চিঠি পড়িতে পড়িতে আবার যেন তাহার পুরাতন মন ফিরিয়া পায়। কলিকাতার আকাশ কি বীভৎস! আর এখানকার ছেলেমেয়েরা যেন কি রকম!

শোভা আসিয়া বলে, দাদা, রেণু বলছিল, তুমি যদি ওর ইংরিজী কম্পোজিশনটা দেখে দাও—

সেই অরুদার চিঠিখানা বিছানার তলায় চাপা ছিল। ডেজিও কবিতা শুনিতে চাহিয়াছিল একদিন।

বলে, বেশ তো।

রেণু ইংরিজী ভালই লেখে।

মোনা লিসার ছবি দেখাইয়া রেণু বলে, কার ছবি?

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

না, ওই মেয়েটি কে?

লা জোকোন্দা, তখনকার এক বিখ্যাত সুন্দরী।

রেণু ছবির ইতিহাস শোনে। মেয়েটি পাঁচশো বছর ধরিয়া অমনই করিয়া চাহিয়া আছে, ওই কুটিল হাসি হাসিতেছে।

শুধোয়, তুমি ছবি আঁক না?

না।

আচ্ছা, তুমি সব সময় ব'সে কি লেখ? শুনেছি, তুমি কবিতা লিখতে পার, আমায় শোনাবে?

তাহার কবিতার সঙ্গে দুইজনের স্মৃতি করুণভাবে জড়িত। আর কেন?

রেণু বলে, পড় না!

অনিচ্ছার সঙ্গে খাতা খুলিয়া বসে, পড়ে—

প্রেয়সী, আজিকে গগন ব্যাপিয়া ওই
মাতাল মেঘের উড়িতেছে এলোচুল,
দূর দিগন্তে মেঘ-মাটি একাকার,
অসীম শূন্যে নাহি সীমা নাহি কূল।

রহিয়া রহিয়া বহিছে সজল বায়,
নিবিড় আঁধার মোর বাতায়ন ছায়—
অবিরল-ধারে কভু ঝরি জলধার
করিছে চিত্ত বেদনায় বেয়াকুল।
বাদল-নিশীথে একেলা জাগিয়া প্রিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে মোর ঘটিছে মনের ভুল।

বিজুলী চমক চমকিয়া যায় মেঘে
ঘন-গর্জ্জনে শূন্য শিহরি উঠে,—
আমি ভাবি প্রিয়,—

তোমার আবার প্রেয়সী কে?

কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, প্রেয়সী কে? মোনা লিসার পিছনে দিগন্তবিস্তৃত পথ জীবন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া আছে। বলে, জানি না।

কবিতা আর পড়া হয় না। আঁচল দাঁতে কাটিতে কাটিতে রেণু বলে, আমি জানি।

কিন্তু রেণু সে কথা বলিবার জন্য দাঁড়ায় না। দ্রুতপদে বাহির হইয়া যায়।

চার

"তোমার আবার প্রেয়সী কে?" প্রশ্নটা মনের ভিতর গুঞ্জন করিতে থাকে। "আমি জানি", রেণু কার কথা বলিল? একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি, বাহু মেলিয়া আসে, কিন্তু ধরা দেয় না, দেহ নাই। বহুদিনের বাঞ্ছিতার কাছে একদা চোখের ইঙ্গিত পাইয়া মনটা যেমন অকস্মাৎ পুলকিত হইয়া উঠে, মধুর আবেশে দেহ লঘু হইয়া যায়, যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে চোখে চোখে রাখিতে ইচ্ছা হয় তখন যেমন তাহাকেই দূরে রাখিয়া নিশ্চিন্তে আত্ম-সমাহিত হইতে বাধে না, তাহার অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইল।

পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া আবার কি শুষ্ক মরুপথে জলধারা নামিয়া আসিল? পুরাতন কবিতার খাতার একটা পাতা সাদা ছিল, সেই সঙ্কীর্ণ স্থানেই ভাবের বন্যা ভিড় করিয়া আসিল।

মোহন মায়া মেলে তোমার এলে আমার স্বপন মাঝে,
চিনি চিনি ভাবছি ক্ষণে, ক্ষণেক ভাবি চিনি না যে!
অনেক কালের যাত্রা, সখি,
আজকে সবি ভুলেছ কি?—
প্রভাতবেলার সোনার আলো, গহন কালো আঁধার সাঁঝে,
মনের মাঝে তোমায় হেরি, বাহিরে সখি চিনিই না যে।

উপলপথে কখনো গতি, ছুটেছি কভু মরুর বুকে—
কভু বা ঘন বনের মাঝে—মৃত্যুপারের অন্ধকূপে ;
কভু বা আলো, কভু বা ছায়া,
রচেছ তুমি মধুর মায়া
অবশ করে গন্ধ শুধু—না জানি কোন্ গন্ধধূপে—
নিশ্বাস শুধু লেগেছে গায়ে গভীর কালো অন্ধকূপে।

বাধা কখন ঘুচিবে সখি, আঁধার কবে হইবে আলো—
প্রদীপ-আলোয় দেখব কবে, কে তুমি এই প্রদীপ জ্বালো !
চিনব কবে, বুঝব কবে,
কে এল এই মহোৎসবে,
কায়ার পরশ পাইব তাহার স্বপন-মায়া যে বুলালো,
যাহার আলোর আভাস প্রাতে, রাতের প্রদীপ সেই কি জ্বালো !

লেখা শেষ হইয়া গেলে আর কিছু ভাল লাগে না। কান পাতিয়া শোনে, ফিরিওয়ালাদের বিচিত্র চীৎকার, কোনটা বোঝে, কোনটা বোঝে না, সকলকে ডাকিয়া জিনিসের দর করিতে ইচ্ছা হয়। সামনের বাড়ির আলিসায় এক জোড়া পায়রা বকবকম করে, ভিতর-বাড়িতে মেয়েদের কলগুঞ্জন। অবসন্ন দ্বিপ্রহরে যেন কালের গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শোভারা সব স্কুলে, বারান্দায় পদধ্বনি শোনা যায় না।

ছাই কবিতা ! খাতাখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া আলমারির ডালা খুলিয়া বইগুলির নামের উপর চোখ

বুলাইয়া যায়, কোনোটাই পছন্দ হয় না। জোলার একখানা কুৎসিত উপন্যাস লইয়া পড়িতে থাকে খারাপ জায়গাগুলি বাছিয়া বাছিয়া। অল্পেই শেষ হইয়া যায়। অবসাদ তখন দ্বিগুণ হইয়া আসে।

বইগুলা এলোমেলো করিয়া দিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। হঠাৎ নীচের কলে জল আসিবার আওয়াজ শোনা যায়, কালের স্তব্ধতার মধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা গতির তরঙ্গ জাগে। এদিক ওদিক হইতে ঝিয়ের দল অবিন্যস্ত-বসনে কাজে আসিতেছে, দুই-একটিকে চকিতের জন্য বেশ লাগে। আপনার বর্ব্বরতা ও নির্লজ্জতায় শিহরিয়া উঠে।

সামনের বাড়ির তেতলার ঘরের জানলার সামনে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়, দ্বিপ্রহরের নিদ্রাভঙ্গের পরে অলস দৃষ্টি দিয়া একবার পৃথিবীটার উপর চোখ বুলাইয়া লওয়াই যেন তাহার অভ্যাস। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া যায়, মুখে যেন একটু হাসির আভাস। জানালার একটা পাল্লা বন্ধ করিয়া আবার সেখানে দাঁড়ায়, পাল্লাটা খোলে আর বন্ধ-হয়। আলুথালু চুলের ঠিক মাঝখানে চওড়া সিঁদুরের রেখা তাহার বুকে আগুন ধরাইয়া দেয়। দেহ উত্তপ্ত, কি যেন একটা অসহ্য ব্যথায় মন পীড়িত হইতে থাকে। সঙ্কোচ হয় না, দ্বিধা হয় না, মেয়েটির দিকে নির্নিমেষ চোখে

চাহিয়া থাকে। একজন, দুইজন, তিনজন, তারপর খলখল উচ্চহাস্য। কতকগুলা কুৎসিত কথার টুকরা!

ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া যায়, স্কুলের ছুটি হইয়াছে। শোভা রেণু আসিল বলিয়া। তাড়াতাড়ি চটি পায়ে নীচে নামিয়া যায়, অকারণেই ফুটপাথে পায়চারি করিতে থাকে।

ঠিক কি অকারণে? স্কুলের বাস আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথমে শোভা, তার পর সুষী, তার পর রেণু। রেণু ও শোভা কি যেন একটা তর্ক করিতেছিল। বাসের পাদানে পা রাখিয়াই রেণু বলে, বেশ, তোর দাদাকেই জিজ্ঞেস করিস। শোভা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বেণী দুলাইয়া সুষীর পিছন পিছন সে বাড়ির ভিতর ঢোকে। বাস চলিয়া যায়।

রেণুর কাছে গিয়া প্রশ্ন করে, কি কথা রেণু?

কিছু না। আজ আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবে?

যাব, যদি সকালের সেই কথাটা স্পষ্ট ক'রে বল।

কোন্ কথাটা?

তুমি যে বললে, আমি জানি। তুমি কি জান, তাই বল।

ও! আচ্ছা, বলব। এখন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

সে রেণুর একটা হাত চাপিয়া ধরে, কি শীর্ণ পাণ্ডুর হাত!

বলে, না, এখুনি বল।

আঃ, ছাড়, লাগে, কেউ দেখে ফেলবে যে!—বলিয়া রেণু ছুটিয়া পলায়। মুখ ফিরাইয়া বলে, তুমি বড্ড বোকা।

বেণীসংবদ্ধ কেশরাশি সমস্ত দিন বাঁধা থাকিয়া কখন একে একে বাহিরে আসিয়া উড়িতে শুরু করিয়াছে। ধূমকেতুর পুচ্ছ। গলির বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সন্ধ্যা হইয়াছে কি না বুঝিবার জো নাই, আকাশ কালো হইয়া আসিয়াছে। গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া আসে।

সামনের বারান্দায় রেণু আসিয়া হাঁকিয়া বলে, শোভা, অরুদা আজ আমাদের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবে, যাবি?

অসহায় পথিক ঝড়-জলে পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বজ্রাঘাতের কথা ভাবে নাই। নির্ম্মম আঘাত!

ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া কঠোরভাবে রেণুর দুই হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলে, বল, কে আমার প্রেয়সী? বাহিরের প্রশ্ন সহজ, কিন্তু মনের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

বিস্মিত পুলকে রেণু তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। বারান্দায় অন্ধকার। দেহের আঘাত মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

রেণু বলে, তুমি জান।

আমি জানি? মিছে কথা।

বেশ, দেখবে এস।—বলিয়া রেণু তাহারই পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে।

এবার সত্যই রাত্রির অন্ধকার, শুধু রাস্তার গ্যাসের আলো ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়া দেওয়ালের স্থানে স্থানে গোলাকার হইয়া পড়িয়াছে। উপরের কুঠরিতে শোভা-সুষীদের দাপাদাপি শোনা যাইতেছে, তাহারা বেড়াইবার সাজ করিতেছে।

বারান্দার আবছা অন্ধকার হইতে ঘরের ঘনান্ধকারে প্রবেশ করিতেই বাহিরের কোলাহল-মুখর জগতের সহিত অকস্মাৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়, চকিতের জন্য মনে হয়, তাহারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে জনশূন্য প্রান্তরে দাঁড়াইয়া। রেণুর উত্তপ্ত নিশ্বাস তাহার বুকে লাগে—ডেজির চুম্বন নয়, ফলসাতলায় ডলির তীব্র দৃষ্টি।

অন্ধকারে মানুষের জন্মান্তরের স্মৃতি ফিরিয়া আসে যেন—সৃষ্টির আদি কালের ; প্রথম মানব-মানবী আদম আর ইভ বুঝি অন্ধকারেই প্রথম পরস্পরের পরিচয় পাইয়াছিল। ইভের চোখ কি এমনই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ? রেণুর তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়, তবু একটা কৌতূহল। ওইটুকু রেণু—অকস্মাৎ এমন হইল কি করিয়া !

রেণু সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া দেওয়ালের ধার পর্য্যন্ত লইয়া যায়, মোনা লিসার ছবির উপর হাত রাখিয়া বলে, এই

দেখ। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া গ্যাসের আলো গোল হইয়া ছবির মুখের উপর পড়িয়াছে, সেই দুর্ব্বোধ্য ক্রূর হাসি।

মোনা লিসা মরিয়াছে। জীবন্ত নারী বুকের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ, তবুও নারী। হাসি চোখ ছাড়িয়া এখনও মুখে আসে নাই। ছবির উপর শীর্ণ হাতখানি,—রক্তে-মাংসে গড়া হাত নয়, ভাষাহীন ইঙ্গিত!

কেমন, হয়েছে?

হ'ল না। আমি বলি।

রেণু বুঝিতে পারে। শোভা-সুষীদের পদধ্বনি সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, ঘরে আসিল বলিয়া। কিন্তু, যে বিহ্বল মুহূর্ত্তে নারী আপনাকে বিস্মৃত হয়, বালিকার জীবনেও কি সেই মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল? দৃষ্টির ও দেহের উন্মাদনা ভাষায় সঞ্চারিত হয়, ছবির উপর হইতে হাতখানি ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া আত্মসমর্পণের ভাষায় বলে, বল।

এই 'বল'র জবাব মানুষের ভাষায় নাই। সে দৃঢ়বলে রেণুকে বক্ষে টানিয়া ধরিয়া তাহার শীর্ণ ওষ্ঠাধরের উপর আপনার উত্তপ্ত ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরে,—অন্ধকারে লেলিহান অগ্নিশিখা, পৃথিবীর উন্মাদ নৃত্য!

শান্ত গম্ভীর কৌতুক-হাস্যময়ী রেণুর সহজ গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? অন্তরের কোন্ প্রস্রবণে আঘাত লাগে কে বলিতে

পারে ? পাষাণ গলিয়া জল ঝরিতে থাকে। রেণু অকারণে কাঁদিয়া উঠে, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া বলে, কেন এমন করলে ? তুমি আমায় অপমান করলে কেন ?

অপমান ?

কলিকাতার স্কুলগুলির উপর কেমন একটা বিদ্বেষ আসে, অপমান ! নয়তো কি ? রেণুর চোখে জ্বালা।

আচ্ছা, আমি এর শোধ নেব।

বারান্দায় আলো জ্বলিয়া উঠে। চকিতে দরজার পাশে আসিয়া শান্ত কণ্ঠে রেণু হাঁকিয়া বলে, বাবা, মেয়েদের সাজকে বলিহারি যাই ! তোদের দেরি দেখে অরুদা ভাই চ'লে গেল।

শোভা সুষী হতাশ হইয়া পড়ে।

রেণু বাহিরে আসিয়া শোভাকে বলে, শোভা, তোর দাদা অমন অন্ধকারে একলা ব'সে আছে কেন ? ওকে ধর্ না, আমাদের সঙ্গে চলুক।

আশ্চর্য্য, যে ঘটনায় পুরুষের জীবনে তোলপাড় হইয়া যায়, মেয়েরা তাহাকেই এমন সহজ লঘুভাবে গ্রহণ করে কি করিয়া ? ডলির কথা মনে হয়। শহরের মেয়েরা কি স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া ? একটা ব্যথা বুকে চাপিয়া বসে।

শোভা বলে, দাদা এখন কবিতা ভাবছে বোধ হয়। আমাদের কথা শুনবে না। তুই বললে যদি যায়।

শোভা ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া দেয়। সে তখনও মোনা লিসার ছবির সামনে দাঁড়াইয়া। রেণু বলে, চল না, একদিন আমাদের জন্যে না হয় একটু ক্ষতিই স্বীকার করলে!

রেণুর চোখে কৌতুক-হাস্য।

রেণুর মুখের দিকে চাহিতে পারে না, বলে, বেশ, চল।

•

ট্রামে করিয়া গড়ের মাঠ, তারপর হাঁটিয়া রেড রোড, ইডেন গার্ডেন, গঙ্গার ধার, উট্‌রাম ঘাট। অর্দ্ধবৃত্তাকার দল। সুষী-করুণার অবিরল প্রশ্নধারায় বিব্রত হইয়া, রেণুর অঙ্গ-স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে পথ চলা। কলিকাতার বৈদ্যুতিক আলোক-উদ্ভাসিত, বিচিত্র যান-বাহন ও পথিকের কোলাহল-মুখর পথ নহে, পরিচিত গ্রামের প্রান্ত যেন। শোভা ও করুণার স্কুলের গল্পের শেষ নাই! বরুণাদিদির হাসি, তরফদারদিদির গাম্ভীর্য্য, কিসিদিদির চুল, রেবা, মালতী, বিনি, আবোল-তাবোল; অতি-পরিচিত জন ও ঘটনার খুঁটিনাটিই যেন একমাত্র আলোচনার বিষয়! গাছের পাতা নয়, আবছা আলো নয়, ধোঁয়াটে আকাশ নয়, বিচিত্র আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নাতীত লোকের কাহিনী নহে। মেয়ে আর পুরুষ, ঘর ও বাহির।

•

নৌকা জাহাজ স্টীমলঞ্চ বয়া যেন ঘাটের কাছে সভা করিতে আসিয়াছে। বিপন্ন জলস্রোতের অস্ফুট হা-হুতাশ। ভারাক্রান্ত বাতাস নিরন্তর কানের কাছে গুঞ্জন করিতেছে যেন, চুপ চুপ।

পৃথিবীতে এত লোক কেন ? প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত ? কাহাকেও কি একটু নিশ্চিন্তে থাকিতে দিবে না ? মাসী পিসী বউদিদি বোনের সঙ্গে কলেজ-স্কুলের ছেলেরা নিশ্চয়ই, অপরূপ জীব ! মেয়েগুলা না জানে কাপড় পরিতে, না পারে সহজ-ভাবে চলিতে ; মিষ্টি কথা বলিতে কি আবার শিখাইতে হয় ! অদ্ভুত ভাষায় অবিশ্রাম বাজে কথার আলোচনা। ঘরের বৈঠকখানায় যাহা শোভা পায়, গঙ্গার ধারে তাহাই অশোভন।

হঠাৎ রেণু বলে, রকম দেখ, কি ছিরি জুতো আর কাপড়ের, আবার হাওয়া খেতে এসেছেন !

শোভা বলে, দেখ্ ভাই, হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল ! ওই ছেলেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর বিয়ের কথা হচ্ছে।

হাসিয়া রেণু বলে, মরুকগে।

আঁচলের স্পর্শ, দেহের নয় ; জেটির পাটাতনের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্য্যন্ত পায়চারি, অর্থহীন আলাপ। রাত্রি গভীর হয়। কলের শেষ বাঁশী বাজে। ধোঁয়ার মেঘ কাটিয়া যায়। আকাশ বাতাস নির্ম্মল। জেটি ক্রমশ জনবিরল হইতে থাকে। বৈদ্যুতিক আলোকশোভিত দূর পরপার স্বপ্নলোকের মায়া বিস্তার করে। জলের মৃদু কলকলও শোনা যায়।

জাহাজের আলোক-মালা, দূরগামী স্টীমলঞ্চের সন্ধানী আলোকে মৃদু-তরঙ্গিত জলরাশির বিচিত্র শোভা, দাঁড়বাহী

নৌকার ছপছপ শব্দ, মাঝিদের কোলাহল, গান, স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর দ্রুতগামী মোটরের হর্ন ও গতিশব্দ, জাহাজের বাঁশী। দূরের পানে চাহিয়া নেশা হয়।

পাটাতনের উপর পায়চারিবিলাসীদের দল বিদায় লয়; জেটির বাসিন্দাদের দুই-একজন করিয়া প্রত্যেক বেঞ্চে দেহ এলাইয়া দেয়, কোথাও বা গোল হইয়া বসিয়া দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করে।

তাহারাও পরিশ্রান্ত হইয়া জেটির এক প্রান্তে কাঠের বাহিরে পা ঝুলাইয়া দিয়া বসে। সামনের দুই-তিনটা জাহাজের বিদেশ-যাত্রার আয়োজন চলিতেছে, উজ্জ্বল আলোকে মোট-মাথায় খালাসীরা ছুটাছুটি করিতেছে। বাঁশীর শব্দ, শিকলের ঘড়ঘড় আওয়াজ, লস্করদের কোলাহল, সব মিলিয়া একটা অপরূপ রাজ্য। পরপারে বোধ হয় শিবপুর বাগানের ঘন বৃক্ষশ্রেণী আবছা আলোয় কালো দেখাইতেছে।

সুষী করুণা ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, শোভা রেণু পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া চুপ করিয়া ভাবিতেছে, সম্ভবত স্কুলের কথা। কিন্তু রাজপুত্রের ঘুম ভাঙিয়াছে; রাজকন্যাকে জয় করিতে আসিয়া রাক্ষসের রূপার কাঠির স্পর্শে রাজপুত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গঙ্গাতীরের মায়া কি সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙাইল? ওই তো বিদেশ-যাত্রার আয়োজন

চলিতেছে, রাজপুত্রকে বাহির হইতেই হইবে ; মোনা লিসার পিছনে অস্পষ্ট দিগন্ত সন্ধানী-আলোকে ঝলকিয়া উঠিতেছে। তাহার চোখে দূরের মায়া, চলার নেশা।

রেণু ভুল বুঝিল। নিঃশব্দ গম্ভীর মূর্ত্তিটিকে তো সে চেনে না। অবহেলা ভাবিয়া চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। শোভাকে ঠেলা মারিয়া বলে, চল্ ভাই, রাত হ'ল, মা বকবে।

শোভারও ঘুম পাইয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

আর একটু থাকো, কাতর মিনতি।

ওই রে, ওকে আবার কবিতায় পেয়েছে।—রেণু খলখল করিয়া হাসিয়া উঠে। বাতাস মেঘকে উড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। দ্বিপ্রহরের হাওয়ায়-ওড়া পালক নয়।

কিন্তু তাহার চোখে এ কি দৃষ্টি! রেণু চমকিয়া ভাবে, বুঝিতে পারে না, মনের স্বচ্ছ লঘুতাই ভারী হইয়া বুকে বোঝার মত চাপিয়া থাকে। ফিরিবার পথে রেণু আর একটিও কথা বলিতে পারে না। শুধু গাড়ি হইতে নামিবার সময় তাহার হাতে একটু মৃদু চাপ দিয়া শান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলে, আজকে যা লিখবে, কাল আমাকে তাই শোনাতে হবে। শোভা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু সে বুঝিতে পারে, ঠাট্টা নয়, ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। কিশোরী-মনের রহস্য—দুর্জ্জ্ঞেয় অতলস্পর্শী। ডেজি নয়, ডলি নয়, মোনা লিসার হাসিও যেন বোঝা যায়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। চোখে ঘুম নাই। আলোও ভাল লাগে না। খাতাখানা টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া আছে। গান মনে আসিয়াছে, কিন্তু সুরটা এখনও ধরিতে পারে নাই। খাঁচার পাখী বাহিরের ডাক শুনিয়াছে, কিন্তু বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

রেণু ঘুমাইতেছে? না, তাহার চোখেও বুঝি ঘুম নাই। কেন? রেণু কি কখনও গভীর স্বচ্ছ নীলাকাশ দেখিয়াছে, কাল-বৈশাখীর উন্মাদ নৃত্য, শ্রাবণের মেঘভারাক্রান্ত নিশ্ছিদ্র গগন, তট-ভাঙা নদীর জলস্রোত, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ঘনায়িত বনশ্রেণী, দ্বিপ্রহরের উদাস বাতাস, বনফুলের তীব্র গন্ধ, রঙের বৈচিত্র্য, দেবমন্দিরের সান্ধ্য শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি? ধোঁয়ায় যাহাদের দৃষ্টি আবিল, নিশীথ-রাত্রে তারার পানে চাহিয়া তাহারা স্বপ্ন রচনা করে না। রেণু তাহাকে বুঝিবে না, সে ঘুমাইতেছে।

জাগিয়া আছে কে? গ্রামের প্রান্তে শীর্ণ নদীতীরের শ্মশানে ডেজির দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই কৌতুক-হাস্যময় মনখানি কোথায় যেন জাগিয়া আছে, কে তাহার ঠিকানা বলিয়া দিবে? স্বামী-শয্যায় শুইয়া ডলি হয়তো জাগিয়া বাতায়ন-পথে অন্ধকার আকাশ দেখিতেছে। আর মা? তাঁহার চোখেও নিশ্চয়ই ঘুম নাই। মৃত্যু-পরপারের সঙ্গে যোগ-সাধনের রহস্য তিনি জানিয়াছেন, কিন্তু ছেলেকে শেখান নাই।

এই তিনটি মৃত ও জীবিত নারীর চিন্তা জাগ্রত মনের উপর

মোহ বিস্তার করে, স্বপ্ন-লোকের দ্বার খুলিয়া যায়। আলো জ্বালিয়া লিখিতে বসে—

আহত বায়ু ফিরিয়া আসে, পশে না আলো-কণা,
প্রহর সেথা স্তব্ধ রহে উদাস আনমনা।
গভীর কালো ব্যাপিয়া আছে,
হিমশীতল বুকের কাছে
পাতাল-পুরীর নাগবালারা ধরিয়া আছে ফণা,—
ধরার আলো-বাতাস সেথা করে না আনাগোনা।

অন্ধকারে বন্ধ ছিল তন্দ্রাহত হিয়া,
পাষাণ-পুরে তুষার সম আছিল মূরছিয়া।
দেখিত হত-চেতন ঘুমে,
কে যেন আসি ললাট চুমে,
পরশ-লোভী আঁধার শুধু উঠিত শিহরিয়া,
আধেক মায়া মিলায়ে যেত আধেক ধরা দিয়া।

এমনি ক'রে কেটেছে দিন কেটেছে কত রাতি,
ঘুমেতে পেয়ে জাগিয়া তারে খুঁজিত পাতিপাতি,
আঘাত হানি তটের বুকে
উর্ম্মি কোথায় মরিছে দুখে,
কে জানে কোথা কাঁপন-সুখে নিবিয়া মরে বাতি!
বন্ধ ঘরের আঁধার শুধু একলা কাঁদার সাথী।

বাহির হতে একদা সেথা চকিতে এল কে সে,
আনিল বহি বাতাস আলো শিথিল এলোকেশে।

চমক আনি অন্ধকারে,
কাঁপন তুলি জড়তা-ভারে,
নিঝুম নিথর পাষাণপুরে তরল হাসি হেসে,
ললাটখানি চুমিল তার গভীর ভালবেসে।

চুমিল তার চক্ষু দুটি, কহিল, "দেখ চাহি—
সুদূর পথ, পাহাড়-বন আলোকে অবগাহি—
লক্ষ যুগ তোমার লাগি
স্বপন দেখি উঠেছে জাগি ;
এবার পথ চলিতে হবে তিমির অতিবাহি—
নিখিল ধরা দিয়েছে ডাক, আমি বারতাবাহী।"

স্বপনসম মিলায় বালা শিহর তুলি চিতে,
সুমুখে চাহে, পিছনে চাহে, চাহে সে চারিভিতে।
বদ্ধ বায়ু অন্ধ কারা,
চকিতে পেল প্রাণের সাড়া,
যুগান্তরের জড়তা যেন টুটিল আচম্বিতে।
ধরিতে চাহে ক্ষণেক-পাওয়া পরম পরিচিতে।

খুঁজিতে এরে অচেনা পথে বাহির হতে হবে,
কে জানে ধরা কাহার লাগি জাগিছে কলরবে।
একটি চুমা ঠোঁটের 'পরে
ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া মরে,
ফিরিয়া পেতে হারানো চুমা বাহির হ'ল ভবে,
সেদিন হতে যাত্রা শুরু, শেষ না জানি কবে!

রাস্তার এপার ও ওপারের বাড়িগুলির অবকাশপথ দিয়া অন্ধকার আকাশের একটা ফালি দেখা যাইতেছিল। তাহারই ঠিক মাঝখানে একটা জ্বলজ্বলে তারা—প্রদীপ্ত চক্ষু যেন, তাহারই পানে নির্নিমেষে চাহিয়া যেন বলে, অসমাপ্ত সাধনা! কারাগারে বসিয়াই পথ-চলার স্বপ্ন দেখিতেছ! সত্যকারের ডেজি-ডলি তোমার কল্পনায় ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। মা কোথায়? সেই তারার পানে চাহিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠে, কাগজটাকে হাতের মুঠায় চাপিয়া বাহিরের রাস্তায় ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু রেণু শুনিতে চাহিয়াছে।

শেষরাত্রির বাতাসেও নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, শ্মশানের চিতার ধূম কোথা হইতে আসিল? মুঠি ধীরে ধীরে শিথিল হয়। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে চেয়ারে বসিয়াই ঢুলিতে থাকে, তারাটাকে আর দেখা যায় না।

রেণু নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঘরে ঢুকিয়াছিল, তাহাকে একেবারে চমক লাগাইয়া দিবে ভাবিয়া। সে তখন টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতেছে। রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি তাহার মুখে পরিস্ফুট, হাতের শিথিল মুঠায় কবিতা-লেখা কাগজখানা। রেণু শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই ছিঁড়িতে পারে নাই, হয়তো রেণুর কথা ভাবিতে ভাবিতেই ঘুমাইয়াছে, মুখে শীর্ণ হাসি। রেণু ক্ষণকালমাত্র থমকিয়া দাঁড়ায়, তারপর ধীরপদে

তাহার নিকটে গিয়া পরম স্নেহে তাহার রুক্ষ কেশে চুম্বন করে; বালিকার মুখেই জননীর করুণা!

সে তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, ঘোর দুর্য্যোগে মাকে লইয়া নদী পার হইবার জন্য খেয়াঘাটে পৌঁছিয়া দেখে, মাঝি নাই; নিবিড় অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-চমকে উন্মত্ত ফেনিল জলরাশি তরঙ্গায়িত মরুভূমির মত বোধ হইতেছে। সে নিজেই মাঝি হইয়া নৌকায় পাড়ি দিবে। মাকে নৌকায় উঠাইয়া নৌকার কাছি ধরিয়া লাফ দিয়া উঠিতে গিয়া সে পিছল মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। মা শুধু উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, ভয় নাই।

রেণুর চুম্বন-স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াই শুনিল, সারারাত বুঝি এমনই ক'রে কাটিয়েছ? আচ্ছা যা হোক! মনে হইল স্বপ্ন। ক্লান্ত দেহ তখনও ঘুমের কাঙাল।

রেণু কাঁধে হাত রাখিয়া বলে, বিছানায় শোওগে।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই শিথিল মুঠি হইতে কাগজখানা মাটিতে পড়ে। অলক্ষ্যে রেণু তাহা কুড়াইয়া লয়। চুম্বনের ইতিহাসের সঙ্গে এ খবরও তাহার অগোচর রহিয়া যায়।

গম্ভীর রেণু সহসা প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে। শোভা একলা নয়, পাড়া-সুদ্ধ সকলে অবাক। শুধু পাশের বাড়ির তেতলার

সেই বধূটি মুচকিয়া হাসে। চুম্বনরত রেণুকে সে দেখিয়াছে। রেণুকে ডাকিয়া বলে, কি গো, সম্বন্ধ এল নাকি? রেণু হাসে, বলে, মরণ!

সেদিন রেণু ইচ্ছা করিয়াই লেখার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। সে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, আবার লিখিতে বসিয়াছে, কিন্তু বিনিদ্র রজনীর ব্যথিত মনটি ফিরিয়া পায় নাই।

পরে হঠাৎ একদিন রেণু জিজ্ঞাসা করে, কই, সেদিনের রাত্রের লেখা আমায় শোনালে না? লেখ নি বুঝি?

লিখেছি, কিন্তু শোনাবার মত কিছু না।

বিনয়! বেশ, চাই না শুনতে।

আঁচল টানিতে গিয়াই বুকের কাছে ভাঁজ-করা কাগজখানির মৃদু খসখস আওয়াজ যেন কানে শুনিতে পায়। চোখে হাসি, মুখে অভিমান।

আচ্ছা, কাল শোনাব, যদি—

যদি কি?

না, থাক্।

শোভা আসিয়া বলে, মিলেছে ভাল—গম্ভীর আর গম্ভীরা।

পাশের বাড়ির তেতলা হইতে উচ্চ হাসি শোনা যায়।

বিনা পরিশ্রমের কবিতা—'রেণু'। রেণুকে শোনাইতে বাধ-বাধ ঠেকে। কিন্তু তবু একদিন শোনায়। রেণু গালে হাত

রাখিয়া মোনা লিসার ছবিখানি দেখিতে দেখিতে নিবিষ্ট চিত্তে কবিতা শোনে, বলে, চমৎকার হয়েছে। ছাপতে দাও।

দূর বোকা, তোমার নাম রয়েছে যে !

তাই তো ! তা হ'লে আমায় দাও, দেখি কি করতে পারি।

চুরি-করা ধন আর দানে-পাওয়া ধন—কোন্‌টা বেশি প্রিয়, রেণু ভাবিতে বসে। হঠাৎ বলে, আর একবার পড় তো, শুনি একটা জায়গায় কেমন খটকা লাগছে।

কোন্ জায়গায় ?

পড়, বলছি।

পড়ে।—

অতিক্রমি যুগান্তের পথ
জীবনের রথ
এত দিনে থামিল কি ? চক্র গতিহীন।
কত রাত্রি দিন
যে মোরে আনিল বহি ঘর্ঘরিত রবে—
অরণ্য-কান্তার ভেদি আপনার বিপুল গৌরবে,
জন্ম হতে জন্মান্তর পার—
সহসা কি তার
বিবশ বিকল অঙ্গ, অকস্মাৎ পথে গেল থেমে ?
মৃত্তিকায় নেমে
চকিতে চাহিয়া দেখি, কাঁপিতেছে রথ,
বিপুল মূর্চ্ছনাহত বীণাতন্ত্রীবৎ।

পুলকে বিস্ময়ে চাই হইয়া ব্যাকুল,
মনের কি ভুল—
একেলা পথের প্রান্তে বাজাইছে বেণু—
রেণু।

কহিনু ডাকিয়া তারে, হে কুমারী বালা,
নির্জ্জন প্রান্তর-ভূমি, এ-পথ নিরালা,
এস তুমি মোর রথে।
এক সাথে যাত্রা করি সঙ্গীহীন পথে।
হাসিয়া থামায়ে বাঁশী, বিস্ময়ে সে কহে,
নহে নহে নহে,
আমি আসিয়াছি এই সরোবরে ঘট ভরিবারে,
রৌদ্র হ'ল খরতর, ফিরিতে হইবে এইবারে।
পান্থ, তুমি ক'রো না মিনতি!—
এত বলি চলে বালা অলসিত গতি,
চাহিল না ফিরে।

মধ্যাহ্নের খর-রৌদ্র সরোবর-নীরে
বিছায় রূপালী মায়া, অরণ্য গভীরে
পত্রছায়ে গুপ্ত রহি কুহুস্বরে ডাকে সঙ্গিনীরে
সঙ্গীহীন পাখী।
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে থাকি থাকি
ক্লান্তপক্ষ চিলের চীৎকার—
আমারি বক্ষের হাহাকার।

শ্রান্ত দেহ ভেঙে পড়ে, ব'সে থাকি রথের ছায়ায়,
বেলা বেড়ে যায়।

সায়াহ্ন-তপন
স্বর্ণমায়া করিয়া বপন
ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে;
দীঘির চঞ্চল কালো জলে
কাঁপিল সাঁঝের তারা। উড়াইয়া ধূলি
ফিরিল গ্রামের পথে হাম্বারব তুলি
গোষ্ঠ হতে ক্লান্ত ধেনু।
—পথপ্রান্তে অন্ধকারে রহিলাম বসি,
আকাশে উদিল শশী—
আসিল না রেণু।

রাত্রি হ'ল অন্ধকার,
অশান্ত কম্পনে বায়ু বৃক্ষপত্রে তোলে হাহাকার,
দূরে গ্রাম-শ্মশানের কুক্কুর শৃগাল
করিছে চীৎকার—যেন বৃদ্ধ মহাকাল
আতঙ্কে রয়েছে স্তব্ধ—আমি একা বসি
দেখিলাম, ধীরে ধীরে অস্তে গেল শশী।

পূর্ব্বাশার প্রান্তভাগে
আরক্তিম আলোক-ইঙ্গিত ধীরে জাগে—
পাখীকণ্ঠে অস্ফুট কাকলী,

নিদ্রাভঙ্গে তন্দ্রাহত মৌনী বনস্থলী
দিবসের দিতেছে আভাস।
শ্যাম দূর্ব্বাঘাস
ম্লান হ'ল শিশিরের আসন্ন বিরহে।
দিবসের সমারোহে
ভুলিতেছে এ-নিখিল নিশীথের বিদায়-বেদনা।

কি ভাবিয়া ছিনু আনমনা,
চকিতে দেখিনু চাহি
শিশিরার্দ্র মেঠো পথ বাহি
উষার উদয় সম আসিতেছে রেণু।
সবিস্ময়ে রহিনু চাহিয়া—
আমারে দেখিল বালা দুটি আঁখি দিয়া।
কহিল সে মৃদুভাষে, হে পথিক, ফিরে এনু,
আমি হব সাথী তব, অজানা এ পথ,
প্রতীক্ষিছে রথ—
তোমা লাগি তাই ফিরে এনু,
আমি রেণু।

যেন সত্যকারের নির্জ্জন পথের পাশে দুইজনে দাঁড়াইয়া। শেষের দিকে গলার স্বর ভারী হইয়া আসে। রেণুর চোখে জল।

হঠাৎ বলে, না, ঠিক আছে। কিন্তু রেণুর সঙ্গে menuটা ভাল মেলে। ওটা বাদ দিলে কেন?

চিত্ত ব্যথিত হয়, রেণু ডলি নহে।

তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া রেণু হাসিয়া বলে, ঠাট্টা নয়, আমি বলছি, তুমি লেখ—

রথখানা গেল ভেঙে, চড়ি চতুর্দ্দোলে
উলুধ্বনি উল্লাস-কল্লোলে
দুজনে করিনু যাত্রা, অজানিত পথ,
সুমুখে পড়িয়া আছে অন্ধ ভবিষ্যৎ।
সেদিন বিদায়-ক্ষণে যত বন্ধুজনা
উৎসুক উন্মনা,
কহে বারম্বার,
রাত যে অনেক হ'ল খোঁজ রাখ তার ?
এখনো বুঝিতে নারি কি করেছ menu,
তুমি আর রেণু।

মেঘ কাটিয়া যায়, দুইজনেই হাসিয়া উঠে। শোভা আসিয়া বলে, অবাক কাণ্ড, তোমরা হাসছ ?

রেণু বলে, শোভার সঙ্গে ধোবা কেমন মেলে বল্ তো ? মিলের কথাই হচ্ছিল, যেমন রেণুর সঙ্গে menu, কেমন মিল ?

শোভা হাসিয়া বলে, মিলের সঙ্গে কিল আরও ভাল মেলে, না ? চল্ ভাই, বাসন্তীদি এসেছেন, মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

শোভা রেণু চলিয়া যায়।

জয়ের আনন্দ, পাওয়ার আনন্দ, না অধিকারের ? ডলির চুরি-করা খাতার কবিতা ডেজি যেদিন মুখস্থ বলিয়াছিল, সেদিনের কথা মনে হয়। কোথায় যেন তফাত আছে।

ডলির চিঠি। ডলি লিখিয়াছে, আজ ডেজির মৃত্যুদিন। আমরা দুইটি প্রাণী তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, তাই আজ তোমাকেই মনে পড়িতেছে বলিয়া চিঠি লিখিলাম।

ডেজির মৃত্যুদিন!

সন্ধ্যাকাশের অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য অকস্মাৎ চিতার আগুন বলিয়া মনে হয়, কলিকাতা—শ্মশান-ঘাট। শকুনি চিল চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে। সহ্য হয় না।

অন্তঃপুরে একেবারে মায়ের কাছে। মা বলেন, কি রে?

বলে, আমি আজ তোমার কাছে শোব মা।

কাকীমার ডাকে রেণু শোভাদের বাড়ি তাস খেলিতে আসিয়াছিল। তাহার চোখ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে, ক্ষণিকের জন্য।

বিজন অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত!

মামীমা হাসিয়া উঠেন, সঙ্গে সঙ্গে শোভা-সুধীও।

মা ছেলেকে কোলে টানিয়া বলেন, পাগলা।

পাঁচ

দেখ, তুমি ভারি গম্ভীর, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমারই ভয় ভয় করে, অন্য লোকের—

ডলি স্বামীর হাত ধরে, বলে, অমন কথা ব'লো না।

এক ফোঁটা জল অনিলের হাতে পড়ে। অনিল আর অনুযোগ করে না। ডলির মাথাটা বুকে টানিয়া লয়। বলে, ডেজিকে দেখতে পেলাম না, একটা দুঃখ রইল, তুমি আজও তাকে ভুলতে পারলে না!

ডেজিকে সে ভুলিয়াছে, কিন্তু আর একজনকে ভুলিতে পারে নাই। সেই একজনের স্মৃতির সঙ্গে ডেজি এমনভাবে জড়িত যে, বিনা প্রয়োজনে সেও আসিয়া পড়ে।

অবসন্ন দ্বিপ্রহরে নির্ব্বাক ডেজির করতলের উল্টা পিঠে সে চুম্বন করিয়াছিল, সেই চুম্বনের স্মৃতি গভীর নিশীথে ডলিকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে, অনিল সে খবর জানে না।

যে কবিতার একটি পদও সময়ে ডলি মনে করিয়া রাখিতে পারে নাই, ডেজির আবৃত্তিতে একদা যে পদগুলি তাহার মনে রঙ ধরাইয়াছিল, আজকাল প্রতিনিয়তই সেই সকল কবিতার পদ মনের ভিতর গুঞ্জন তুলিতে থাকে, অনিলের কাছে তাহার কোনও অর্থ নাই।

জ্বলন্ত উনানের ভিতর হাত ভরিয়া দিয়া তাহার কবিতার খাতা উদ্ধার করিতে ডেজি দ্বিধা করে নাই। নিষ্ফল হইয়াই ডেজি কাঁদিয়া বলিয়াছিল, দিদি, কেন এমন করলে? সে তাহার বোন ডেজি নয়, যাহাকে তপস্যা করিয়াও সে আয়ত্ত করিতে

পারে নাই, ডেজি যেন তাহাকেই স্বচ্ছন্দ-লীলায় আপনার করিয়াছিল, ডেজিকে সে ভুলিবে কেমন করিয়া? সেই ডেজিকে আর কেহ চিনিবে না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ডেজি প্রলাপ বকিয়াছিল, দূর, পাকা করমচায় বুঝি আবার লাগে? শুনিয়া বোনের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ ভুলিয়া সে তাহার বুকের কাছটা দেখিয়াছিল। জামায় করমচার দাগ ছিল না, কিন্তু ডলির বুকের সে দাগ আজও মুছিল না।

শ্মশানের আগুন কবে ছাই হইয়া গিয়াছে।

বাবার পড়ার ঘরের যে মিনিয়েচার বুদ্ধমূর্ত্তিটি দেখাইয়া সে একদা সন্ন্যাসের কথা তুলিয়াছিল, সেটি ডলি সঙ্গে আনিয়াছে, ড্রেসিং-টেবিলের মাঝখানে বসিয়া তাহা বহুবিস্মৃত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত নির্ব্বাণ-মুক্তির হাসি হাসিতেছে। কিন্তু যশোধরা কি কাঁদিয়াছিল?

স্বামীকে তাহার ভাল লাগে। স্বামীর দাবির সঙ্গে আর একজনের অ-দাবির কোনও বিরোধ নাই। তাহারই মনের রাজ্যে দুইজনে নিরুপদ্রবে পাশাপাশি রাজত্ব করে। কিন্তু ভেদ-রেখা টানা কঠিন।

স্বামীর মনে সংশয় নাই, তাহার মনেও নাই। দেওয়া-নেওয়ার কোথাও কোনও ফাঁক নাই। দিনের আলোক ব্যবধান রচনা করে না; শয়ন-কক্ষে প্রদীপ যতক্ষণ জ্বলে, ততক্ষণই স্বামী

ঘরখানাকে ভরিয়া রাখে। কিন্তু আলো যখন নিবিয়া যায়, অন্ধকার গাঢ় হইতে থাকে, নিমেষবিহীন নক্ষত্রের সহিত বাতায়ন-পথে তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হয়, তখন স্বামীর অস্তিত্ব ডলি কল্পনা করিতে পারে না। অন্যজনের তখন অপ্রতিহত প্রভাব।

ভরা মধ্যাহ্নেই মেঘে যখন আকাশ কালো, বিদ্যুদ্দীপ্ত আকাশ তখনই নিশীথ-স্বপ্ন রচনা করে। ডলিকে গম্ভীর মনে হয়।

শাশুড়ী লক্ষ্মী-বউমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে চান না। স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে মায়া হয়। কিন্তু তবু নিস্তব্ধ মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে, নিশীথ-রাত্রে মন হু-হু করিয়া উঠে। বেড়ার ধারে ধারে রক্তজবা ফুটিয়াছে, মাটির সেই পরিচিত গন্ধ এখানে কোথায়?

কতদিন হইয়া গেল, সে মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। তাহার হাতের লেখাটি পর্য্যন্ত ডলি দেখিতে পায় না। মা শুধু মাঝে মাঝে ডলির খবর লন, ডলি তাঁহাকে ভুলিবার অবসর দেয় না।

একদিন মায়ের চিঠি আসিল, মা লিখিয়াছেন, ডলি মা, তোকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। যে গাঁ আমার স্বর্গ ছিল,

নিবিড়তম সুখ এবং গভীরতম দুঃখের স্মৃতি যে গাঁয়ের সঙ্গে জড়িত, তোর কথা ভাবলেই আমি যেন সেই গ্রামখানিকেই স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার পাগল ছেলে বোধ হয় সে গাঁকে ভুলেছে; তার পড়ায় মন। জামাইয়ের সঙ্গে তুই কি একবার কলকাতায় আসতে পারিস না, মা?

ডলির জিদ। শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হয়।

সে কাসুন্দি ভালবাসিত। ডলি শাশুড়ীর কাছ হইতে বোতল চারেক কাসুন্দি সংগ্রহ করে। এইটুকু আয়োজন।

ট্রেনে ডলি যেন ছোট মেয়েটি, এটা কি, ওটা কি, ওটা বুঝি নদী? ভারী ছোট তো! প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু ভিজি। দু পয়সার ডালমুট কেনো না!—ইত্যাদি প্রশ্নে ও আবদারে অনিল ব্যতিব্যস্ত হয়। এ ডলিকে অনিল দেখে নাই। মেঘাবৃত আকাশের তলে বাতায়ন-পাশে বসিয়া যে ডলি নিশ্চল চক্ষে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে, দুইটি আলগা হাত কোলের উপর রাখিয়া দেয়, সেই নির্ব্বাক ডলিকে সে চেনে। কিন্তু বাড়ির বাতায়ন আর ট্রেনের বাতায়নে তফাত আছে।

ঝড়ের বেগে ট্রেন ছুটিয়াছে। পরিচয় সম্পূর্ণ না হইতেই সব কিছু দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায়। দুই ধারে সবুজ মখমলের আস্তরণ।

একটা গান গাও না! ডলির মনে সুর আসিয়াছে, কিন্তু সে গাহিতে পারে না।

অনিলকে গাহিতে হয়, দুইজনের অজ্ঞাতসারে দুইজনের হাত পরস্পরের মুঠির ভিতর আসিয়া পড়ে।

ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে—
তাই তোমারি সারি-গানে
সে আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি—
ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়া-তরীর মাঝি!
অশ্রু-ভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি!

উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।
ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়া-তরীর মাঝি!
অশ্রু-ভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
ভোরবেলা যে—

শিথিল হাতের মুঠি বেঞ্চের উপর পড়ে।

ডলির চোখে তীব্র জ্বালা; বিদায়-বেলায় ফলসাতলার ডলি; অতি নিকটে মুঠির মধ্যে পাইয়াও অনিল ডলিকে ধরিতে পারে

না। মুহূর্ত্তের মধ্যে শরতের নির্ম্মল নীলাকাশে শ্রাবণ-রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠে। অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য! দুর্জ্জ্বেয় স্ত্রীচরিত্র অনিলকে হতাশ করে।

এমন কিছুই নয়, সামান্য একটা গান, অনিল তেমন ভাল গাহিতেও পারে না। ঝমঝম করিয়া ট্রেন তেমনই চলিতেছে, স্টেশনের ক্ষীণ আলো, আর পথের অন্ধকার। জোনাকির ঝিকিমিকি অন্ধকারের বুকে রেখা টানিয়া চলে, আকাশের তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে, নয়তো মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করে।

ভোরবেলা যে খেলার সাথী—

মিথ্যা কথা। খেলার সাথী কেহই ছিল না। নদী আর তটভূমির বন্ধুত্ব! বর্ষার নদী কূল ছাপাইয়া যায়, সমুদ্রে গিয়া ভাঙা কূলের কথাও মনে থাকে না। নদীর আলিঙ্গন তটের বুকে অক্ষয় হইয়া আছে, কিন্তু তটের আলিঙ্গনে বর্ষার ঘোলা নদী শরতে নির্ম্মল হইয়া যায়, তখন নদীর বুকে আকাশের তারা স্বপ্ন বিস্তার করে, স্বচ্ছ শীর্ণ মেঘও।

ডলি চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, চোখের জল দেখা যায় না। অনিল বলে, তোমার অন্ত পাওয়া ভার।

ডলির মৃদু হাসি ক্ষণিকের জন্য দেখা যায়। বলে, ভাবছি, কলকাতা কেমন !

কলেজ, মেস, চায়ের দোকান, ঘোলের শরবত, ফুটবল, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, গড়ের মাঠ, উচ্ছ্বসিত অনিলের স্মৃতিসমুদ্র আলোড়িত হয়। ছাদে মেয়েরা কাপড় শুকাইতে আসিত, বৈকালে বই-হাতে পায়চারিও করিত।

তুমি হরি ঘোষ স্ট্রীট জান ?

খুব, আমাদের যতীনের বাড়ি সেখানে, যতীন ভারি আমুদে, দেখবে, হয়তো স্টেশনেই হাজির থাকবে। কিন্তু হরি ঘোষ স্ট্রীটের খবর কেন ?

সেখানে কাকীমা থাকেন, তাঁকে অনেক দিন দেখি নি। দেখতে ইচ্ছে করে।

কাকীমা ?

গাঁ-সম্পর্ক, সেই যাঁদের দেউড়িতে চাঁপাগাছ ছিল।

ও।

গাঁ-সম্পর্কই বটে, ডলি মনে মনে হাসে।

ভোর হইয়া গেল। দূরে দূরে তেলকল-পাটকলের রাজত্ব। গ্রাম ক্রমে শহর হইতেছে। বড় বড় বাড়ি, অসংখ্য লোক।

শ্রীরামপুর, লিলুয়া, হাওড়া। লোক গিজগিজ করিতেছে,

কুৎসিত কোলাহলে আকাশ মুখর, ধোঁয়া, তবু সুন্দর। কুৎসিতের উপর মায়া-প্রলেপ পড়িয়াছে।

যতীন স্টেশনে আসে নাই। ছাই বন্ধু! হরি ঘোষ স্ট্রীটে থাকে।

গাড়িঘোড়া লোকজন অট্টালিকার অরণ্য। ট্যাক্সি ছুটিয়া চলে, এক দুই তিন চার, অসংখ্য পথ আর গলি, মানুষে রাস্তা চেনে কেমন করিয়া?

তুমি সব রাস্তা চিনতে পার?

অনিল হাসে। বলে, কাজটা কঠিন নয়, চেষ্টা করলে তুমিও পারবে। অনিলের হাতে চাপ পড়ে—উৎসাহের।

অনিল দাদার বাসাতেই উঠিল।

ছয়

ডেজি মরিয়াছে। ডলি আর রেণু, অটল পাহাড় আর খরস্রোতা নদী। ডেজি ছিল মাঝামাঝি একটা কিছু।

কুয়াশা আসিয়া মাঝে মাঝে পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে, পাহাড়ের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। রৌদ্র উঠে, পাহাড় হাসিতে থাকে, গম্ভীর। তরতর করিয়া নদী বহিয়া যায়। নির্ম্মল নিশীথে নদীর বুকে আকাশের তারা কাঁপে, শ্রাবণ-সন্ধ্যার

মেঘভারাক্রান্ত আকাশ থমথম করিতে থাকে। হেমন্তের বিশীর্ণ নদী ঝকঝক করে, ক্ষুরধার খাঁড়ার মত। এখন হেমন্তকাল।

মায়ের পাশে শুইয়া গাঁয়ের কথা মনে পড়ে, কাদামাটির গন্ধ, দ্বিপ্রহরে পাখীর কলকাকলী, মৌনী সন্ধ্যা, নির্ম্মল নীলাকাশ, শিরীষ-বাঁশবনে ঝিরঝিরে বাতাস, ডলির উগ্রগম্ভীর মূর্ত্তি; পাশের ঘরে তখনও রেণু-শোভা-মামীমারা তাস খেলিতেছে; তাহাদের কলহাস্য গ্রামের স্বপ্নকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করে শহর আর গ্রামের দড়ি টানাটানি চলে।

মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আস্তে আস্তে উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়, আকাশ দেখা যায় না, গলির ওপারের চারতলা বাড়িটা বিকটাকার দৈত্যের মত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া। একটু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ঝাপসা কাচের আবরণ ভেদ করিয়া গ্যাসের আলো রাস্তার জলের উপর চিকচিক করে, সামনের বাড়ির দোতালার কানিসে জলবিন্দু মুক্তামালা বলিয়া ভুল হয়।

জানালা ছাড়িয়া সন্তর্পণে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়, সামনেই ছোট মামীমার ঘর, তাঁহারই বিছানায় বসিয়া শোভা রেণু বিন্দু আর ছোট মামীমা তাস খেলিতেছে। রেণুর শুধু কনুই অবধি দুইটি হাত আর হাঁটুর কাছটা দেখা যাইতেছিল। হেমন্তের বিশীর্ণ নদীই বটে।

সে নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া ছিল, রেণুর জানিবার কথা নয়। হঠাৎ মনে হইল, রেণু জানিতে পারিয়াছে, তাহার মুখ আর বুকের আধখানা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল, মুখে মৃদু হাসি—কৌতুকের, তাসখেলার সঙ্গীদের পক্ষে সে হাসি সম্পূর্ণ নিরর্থক ; অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যে তাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ কৌতুকের আভাস। সে অবাক হইল। জননী গর্ভে সন্তানের আগমন অনুভব করে ; খরদ্বিপ্রহরেই হঠাৎ কেকাধ্বনি শোনা যায় ; মেঘ উঠে।

খেলার মাঝখানেই রেণু হঠাৎ তাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে কাকীমা, বাড়ি যাই। বলিয়াই উঠিয়া পড়ে। কাকীমা বলেন, এই খেলাটা শেষ হোক, তারপর যাস।

বিন্দু গাঁয়ের মেয়ে, ঘাড় বাঁকাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলে, দেখব ভাই, দেখব, যখন বর আসবে, তখন এ ঘুম থাকবে কোথা!

পালাটা শেষ করিতেই হয়। সুবিন্যস্ত চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইয়া এলোমেলো করিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে রেণু খেলে।

খেলা শেষ হইয়া যায়। এখনই বারান্দার আলোটা জ্বলিয়া উঠিবে। সে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া পড়ে।

আলো জ্বলিল। শোভা রেণু বাহিরের বারান্দায় কিছুক্ষণ কোলাহল করিয়া বাহির-বাড়ির দিকে গেল। একটা লম্বা বারান্দা মাত্র ব্যবধান। সেও বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। স্পষ্ট

শুনিতে পায়, তাহারই ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া রেণু বলিতেছে, দাঁড়া ভাই, তোর দাদার বই একটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই। মাথাটা যেমন গরম হয়েছে, খানিকক্ষণ তো ঘুম হবে না।

শোভা আপত্তি করে, না ভাই, দাদা জানলে রক্ষে থাকবে না। রেণু হাসিয়া উঠে। সে বুঝিতে পারে, এ হাসি শোভার কথার জবাব নয়। তাহাকে যেন .প্রশ্ন করে, আমাকে শাস্তি দেবে তুমি?

রেণু আপত্তি শোনে না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া খানিকক্ষণ মোনা লিসার ছবিটা দেখে, তারপর টেবিল-আলমারির বই ঘাঁটিতে থাকে।

শোভা বলে, পারি নে ভাই তোর সঙ্গে, যা হোক একটা নে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

রেণু বলে, তুই ঘুমোগে যা না, আমি কি আটকে রেখেছি তোকে?

বা রে, তুই এত রাত্রে একা যাবি নাকি?

তুই হবি আমার বডিগার্ড!

রেণু এত হাসিতেও পারে! বলে, কেন, রামসিং কি মরেছে? রামসিং বাড়ির দরোয়ান।

শোভার সত্যই ঘুম পাইয়াছিল, সে বলে, তোর যা খুশি কর, আমি চললাম।

বারান্দায় আলো নিবিয়া যায়। রেণু কান পাতিয়া শোনে, শোভার পায়ের শব্দ নয়, শোভা এত আস্তে পা ফেলিবে কেন?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে একটা ডিক্সনারি খুলিয়া পড়িতে শুরু করে। জানালার কাছ অবধি আসিয়া পায়ের শব্দ থামে।

রেণু গুনগুন করিয়া গান গায়—

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়,
মরি, এ কি তোর দুস্তর লজ্জা!

রেণুর এ গর্ব্ব ভাঙিতেই হইবে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। রেণু কাগজ কলম লইয়া কি জানি লিখিতেছে।

মাল্য যে দংশিছে হায়, তোর শয্যা যে কণ্টক-শয্যা—
মিলন-সমুদ্র-বেলায়—

রেণু চকিতে উঠিয়া আলো নিবাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পিছনে ফিরিয়াও দেখে না। তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে একটা নূতন গান ধরে—

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা,
এখনো মরণ-ব্রত জীবনে হ'ল না সাধা—
এখনো রহিল বাধা—

রেণু, রেণু!

রেণু ততক্ষণ রামসিংকে লইয়া দরজা খুলিয়া পথে বাহির হইয়াছে। একটা গভীর ব্যথায় সমস্ত দেহ-মন টনটন করিয়া উঠে। নিজের ঘরে ঢুকিয়া রেণুর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসিয়া,

অন্ধকারেই মোনা লিসার ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, সত্যকার ছবি দেখিতে পায় না, তবু স্পষ্ট দেখে, সেই দিগন্ত-বিস্তৃত পথ, সেই ধূসর শৈলশ্রেণী ; তাহাকে যেন বলে, কাপুরুষ, আর কতকাল এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, সময় বড় বেশি হাতে নাই।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, রেণু কি জানি লিখিতেছিল। আলোটা জ্বালিয়া টেবিলের সামনে আসিতেই দেখে, একটা কাগজে বড় বড় করিয়া লেখা—কাপুরুষ, মার আঁচলে আশ্রয় নিতে হ'ল শেষে ? আমাকে তোমার এত ভয় ?

আর লিখিতে পারে নাই। রেণু তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, কিন্তু ভুল ভাঙিবারও তখন আর উপায় ছিল না।

তাহার মন তাহাকে বলিয়াছে, কাপুরুষ। রেণুও তাহাই বলিল।

খাতা লইয়া সে কবিতা লিখিতে বসিল।—

তুমি ভুল করিয়াছ সখি,
আমি ভুলি নাই,
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কাঁপিছে প্রান্তর-বায়ু
মরীচিকা তাই।
শুষ্ক ধূলি-পত্র পথে ঘূর্ণ্যাবেগে ধরে ফণা,
আকাশ পাণ্ডুর,
নেহারি আপন চোখে সেথা শ্যাম সুগম্ভীর
নীরদ মেদুর—

বসিয়া বনানীছায়ে তাপদগ্ধ ধরণীরে
ছায়াচ্ছন্ন ভাবি
বর্ষণ কামনা কর। আমি নিঃস্ব রিক্ত হায়—
শ্মশান-বৈরাগী,
আশ্রয়-কুটীর হেরি তীক্ষ্ণ তীব্র রৌদ্রে বসি
ভয়ে শিহরাই।
তুমি ভুল করিয়াছ সখি,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখি,
আমি ভুলি নাই।
দেখিয়াছ অগ্নিকণা ক্ষণে ক্ষণে হানে দীপ্তি,
দেখ নাই ছাই।
আমার নয়নে তুমি ভুল ক'রে দেখিয়াছ
স্বপ্ন-মদালস—
চির-পথিকের ক্লান্তি, সে নহে স্বপন, সখি—
দেহ যে বিবশ!
স্বপনে পরশ লভি বাহির হয়েছি পথে—
পথিক বিহ্বল,
হয়তো মনের ভুলে কখনো হয়েছে আঁখি
ঈষৎ সজল,
হয়তো চকিতে কভু নয়নের জল মুছে
পিছু ফিরে চাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখি,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখি,
আমি ভুলি নাই।
জননীর স্নেহাঞ্চল আসিছে নিবিড় হয়ে,
যাব আমি তাই—
আমি যাব, বাহুবন্ধ হইল নিষ্ফল, সখি,
ব্যর্থ অভিমান,
জীবন-বীণায় মম কাঁপিতেছে তীব্র সুরে
মৃত্যু-তন্ত্রীখান।
সে সুর শোনে নি কেহ, শুনেছে আমারি মন,
হয়েছি ব্যাকুল—

নাঃ, রেণুর কাছে এই সাফাই দিতে যাওয়াই তো দুর্ব্বলতা। তাহার দেহ যে ক্লান্ত, মন যে আর চলিতে চাহে না, ইহা তো তাহার প্রমাণ। রেণু নিশ্চয়ই বুঝিবে। খাতার পাতাটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তাল পাকাইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে রেণুর লেখা কাগজটাও। আবার মায়ের কাছে।

মায়ের তখন ঘুম ভাঙিয়াছে। কোথায় গিছলি রে?
একটা লেখা মনে এসেছিল।
মা ছেলের পিঠে হাত বুলাইতে থাকেন।

ডলিকে স্বপ্নে দেখে।

বিবাহরাত্রের শাড়ি-পরা ডলি তাহার পায়ে হাত দিয়া ডাকে, দেখ, ডেজি তোমায় ডাকছে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। ডেজি? চুলের গোছার খামটা কোথায় রাখিয়াছে কিছুতেই স্মরণ করিতে পারে না। ডলি বুঝিতে পারে, বলে, আমার কাছে আধখানা ছিল, এই নাও। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, ডেজি একলা আছে।

পথের কথা মনে নাই। একেবারে গাঁয়ের নদীর ধারে। বর্ষার নদী কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান-ঘাটের চিহ্ন নাই। খাড়া পাড়ের উপর চালাটা শুধু দাঁড়াইয়া বাতাসে কাঁপিতেছে। যাহারা মড়া পোড়াইতে আসে, তাহারা এখানে বিশ্রাম করে, কাঠ রাখে, বৃষ্টি আসিলে এখানেই আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ডেজি কোথায়?

উত্তরে কোথায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বন্যার গেরুয়া জল গোঁ-গোঁ করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে।

ডলি বলে, ওই দেখ।

জল হইতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত শুধু দুইখানা হাত। ডেজিরই বটে। পাকা করমচার দাগ বুকের কাছে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে। ডলি জলে ঝাঁপ দেয়।

আর কিছু মনে নাই।

রেণু বলে, মেয়েরা কাঁদে না, স্বপ্ন দেখে না।

সে বলে, স্বপ্ন দেখতে হ'লে ঘুমুতে হয়, মেয়েরা ঘুমোয় না।

শোভা আপত্তি করে, না দাদা, আমি স্বপ্ন দেখি।

রেণু হাসে। বয়স একই, অথচ কত তফাত! বলে, কাছের জিনিস ভুলে দূরের স্বপ্ন দেখা বুঝি খুব বাহাদুরি?

বাহাদুরি নয়, স্বভাব। কিন্তু অরুদার মতো লোকও তো আছে রেণু, যারা কাছকে খুব ভাল ক'রেই দেখে।

সে বরঞ্চ ভাল। যার অস্তিত্ব নেই, তার বন্দনা করার চাইতে যাকে ধরা-ছোঁয়া যায়, তার স্তব রচনা করা ঢের ভাল।

ধরা-ছোঁয়া যায় তবে? নতুন খবর।

সূতোয় বাঁধা বঁড়শি চাই, বিনি সূতোর মালায় কাজ হয় না।

শোভা রাগিয়া উঠে। এই বুঝি তোর পড়া বুঝিয়ে নিতে আসা? খালি বাজে বকবে, আজ বাদে কাল টেস্ট পরীক্ষা না?

তুই পড়্‌গে না, তোকে কে বারণ করছে?

শোভা বলে, নিজের মাথা তো খেয়েছ, দাদার মাথাটি সুদ্ধু খাবে, আমি পিসীমাকে বলছি গিয়ে।

মাথা থাকলে তো খাব শোভা, মাথা নেই।

শোভা রাগ করিয়া উঠিয়া যায়, রেণু দাদাকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না; দাদাটাও যেন কেমন, এসব সহ্য করে।

রেণু হঠাৎ বলে, দেখ, আমার একটা কথা মনে হয়, ওই মোনা লিসার ছবিটা পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েদের সতীন।

মানে ?

দেবে আমার এই লেখাটা কারেক্ট ক'রে ?

লেখা কারেক্ট করে। রেণুর শীর্ণ দেহ আরও শীর্ণ হইয়াছে, চোখের দিকে চাওয়া যায় না, এত দীপ্তি! হাতের লম্বা আঙুলগুলি বার বার মুষ্টিবদ্ধ করে আর খোলে। খপ করিয়া বাঁ হাতে রেণুর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলে, তুমি ভুল বুঝেছ রেণু, আমি কাপুরুষ নই।

তবে ? রেণুর মুঠি শিথিল হইয়া আসে। চোখের দীপ্তি কুয়াশাচ্ছন্ন।

সে চুপ করিয়া রেণুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। রেণু বলে, আমি আর পারি না। ওই ছবিটা দূর ক'রে দাও।

রেণুর কাঁধের উপর হাত রাখে।

রেণু বলে, তোমার নাগাল পাই না যে!

পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত পথিক গাছের ছায়া ছাড়িয়া কুটীরে আশ্রয় লইয়াছে। বেড়া-ঘেরা কুটীর। সবুজ লতায় বেড়া আচ্ছন্ন, তাহাতে লাল ফুল ফুটিয়াছে। প্রাঙ্গণের বেলী-যূথীর গন্ধে বাতাস ঘন হইয়া উঠিল।

জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার যেন রূপ রস গন্ধ স্পর্শে ভরিয়া উঠিয়াছে। অনুভব হইল, যেন তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারই

শিয়রে বসিয়া। হাত বাড়াইতেই কোমল রেশমের মত এক গোছা চুল হাতে ঠেকিল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ, মাথা। টানিতে হইল না, আপনা হইতেই মাথাটা বুকের উপর আসিয়া পড়িল, যেন একখানা তরবারি। বুক কাটিয়া রক্ত ছুটিল বুঝি!

নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।

·

মোনা লিসার ছবিখানি ট্রাঙ্কে আশ্রয় লইয়াছে।

আর একটা পরীক্ষা হইয়া গেল—ইণ্টার আর্ট্স। রেণু-শোভার ম্যাট্রিক। সুপ্রচুর অবসর। ভারাক্রান্ত মন। একটা কিছু ঘটিতেছে, এইটুকু মাত্র জ্ঞান আছে। কিন্তু জল উত্তপ্ত হইলেই বাষ্প হইয়া যায়, জল থাকে না।

গভীর অন্ধকার রাত্রের অস্পষ্ট অনুভূতি, স্বপ্নও হইতে পারে; মন জানে, তা সত্য।

অসহ্য আনন্দে শুধু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তারপর মুখখানা কখন বুক হইতে উঠিয়া গিয়াছে, চুলের বোঝা সরিয়া পড়িয়াছে, জানিতে পারে নাই। বুকে শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল তখনও উত্তাপে বাষ্প হয় নাই। রেণু কাঁদিয়াছিল।

দিনের আলোকে আজও তাহা মিথ্যা বলিয়া ভ্রম হয়। রেণুর হাসি কমে নাই, বাড়িয়াছে।

স্টীমারে ক'রে আজ বেড়াতে যাবে দাদা? রেণু বলছিল।

যাব। আর কে কে যাবে?

করুণা সুধী রেণু আর আমি, আবার কে?

রেণু হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলে, ললিতও যাবে। ললিত বেণুর ছোট ভাই।

সে চমকিয়া উঠে। মেয়েদের এই ছোট ভাই কি বোনকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার মধ্যে আত্মরক্ষার একটা সহজ বুদ্ধির পরিচয় আছে; হয়তো কথা বলার একটা অবকাশও ইহাদের সাহায্যে তাহারা রচনা করে। মনে পড়িল, রেণুর আত্মীয়-পরিজন আছে, গণ্ডি আছে।

আকাশে থাক দেওয়া মেঘ—সাদা, ধূসর, গভীর কৃষ্ণবর্ণ। মাঝে মাঝে পেঁজা-তূলার মত বন্ধন ছিঁড়িয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হয়তো কোথাও বৃষ্টি নামিয়াছে।

বড় মামীমা বার বার সাবধান করিয়া দিলেন, মেয়েরা যেন রেলিঙের ওপর ঝুঁকে জল না দেখতে যায়। রেণুর মা ঝি-মারফৎ বলিয়া পাঠাইলেন, ঝড়-বাদলের দিন, ফিরতে বেশি রাত হয় না যেন।

মোটরে করিয়া একেবারে চাঁদপাল ঘাট। বেলা ছিল, তবু অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আকাশে নিশ্চল মেঘের তরঙ্গ, গঙ্গার মেটে জলে তাহার ছায়া—অপরূপ! স্বপ্ন কি শুধু মানুষই

রচনা করে? প্রকৃতি প্রতিনিয়ত স্বপ্নের জাল বুনিতেছে, কুৎসিতে সুন্দরে, ভীষণে মধুরে অপূর্ব্ব সুষমা ও বৈচিত্র্য।

দোতলা স্টীমার। রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত। উপর-তলার সামনের দিকটা ফার্স্ট ক্লাস, গুটিকয়েক বৃদ্ধ নাতি-নাতিনীদের লইয়া আয়ু-বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার লোভে গঙ্গায় হাওয়া খাইতে চলিয়াছেন, দুইজন সাহেব—ফিরিঙ্গীও হইতে পারে। আর একটি তরুণ যুবক গুটিতিনেক কিশোরী ও একটি ফ্রক-পরা বালিকাকে লইয়া সামনের একটা গোটা বেঞ্চি দখল করিয়া হাসি ও গল্পে সমস্ত স্টীমারখানাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

স্টীমারের দুই পাশে একতলা হইতে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির সামনেই খানিকটা করিয়া রেলিং-ঘেরা জায়গা, উপরে আকাশ, নীচে তিন দিকে জল। রেলিঙের ধার ঘেঁষিয়া তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইল।

ওপারে শিবপুর, আবার এপারে তক্তাঘাট। পায়ের নীচে জল কলকল করিতেছে। ললিতের এক হাত ধরিয়া তাহারই ঠিক পাশে রেণু, রেলিঙের উপর হাতে হাত ঠেকিতেছে। শোভা রেণু চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া। ললিত, সুখী ও করুণার প্রশ্নের শেষ নাই।

ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়া লালচে রোদের আভা মুখে লাগিতেছে। মাথার উপর স্টীমারের কালো ধোঁয়া আর সাদা গরম বাষ্প একসঙ্গে মিশিয়া একটা বিকটাকার অজগরের মত

দেখাইতেছে। মাথায় গায়ে কয়লার গুঁড়া আর জলকণার বৃষ্টি। জলের আঘাতে বয়াগুলি হেলিতেছে দুলিতেছে, পাল উড়াইয়া নৌকা চলিয়াছে, বিরাটকায় জাহাজগুলি স্থির দাঁড়াইয়া; লোকজন, মাঝি-মাল্লা, দাঁড়ের শব্দ, স্টীমারের বাঁশী—একটা নূতন জগৎ যেন। ঘাটের কাছে প্রাচীন জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, লোক উঠে, নামে। কিন্তু তার পরই জাহাজ, স্টীমার, নৌকা, বয়া, লোকজনের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। উপরে—আকাশে কালো ধোঁয়াটে মেঘ, নীচে—অবিরাম জল-প্রবাহ; পরপারের ঘন বনশ্রেণী, শহর নাই, গ্রামের মোহ।

খিদিরপুর ডক, কিং জর্জ্‌স ডক, বটানিক্যাল গার্ডেন, মেঘাবৃত সন্ধ্যা। রেণু একই ভাবে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, একটিও কথা বলে নাই। নূতন রেণু। সুখী করুণা ললিত এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে, শোভা তাহাদের খবরদারি করিয়া পারে না। রেণুর কাছে আসিয়া বলে, কি দস্যি মেয়ে বাবা, ললিত তো খুব লক্ষ্মী। রেণু, তোকেও কি কবিতায় পেল নাকি? দাদার ছোঁয়াচ লেগেছে?

রেণু বলে, দেখ্‌, দেখ্‌।

সেই তরুণটি কাব্য-বিহ্বল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বয়স্কা কিশোরীটির অঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়াছে। মেয়েটি উঠিতে পারিলে বাঁচে।

হাতে একটু চাপ পড়ে। রেণুর মুখে হাসি।

শোভা বলে, আ মর্! ওদের সঙ্গে আলাপ করবি ভাই?

কি দরকার? বেচারা হয়তো অনেক পয়সা খরচ ক'রে ওদের এনেছে, ওর লোকসান হবে।

দরদ দেখ। শোভা হাতের ইশারায় একটি মেয়েকে কাছে ডাকে।

মেয়েটি একটু ইতস্তত করিয়া পাশের সঙ্গিনীকে কি জানি বলিয়া কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করিতে করিতে কাছে আসে। পিছনে পিছনে আরও দুটি মেয়ে। যুবকটি ততক্ষণে সোজা হইয়া বসিয়াছে।

শোভা প্রশ্ন করে, তোমরা কদ্দূর যাবে?

রাজগঞ্জ।

আমরাও রাজগঞ্জ যাব। ও তোমার দিদি বুঝি?

না, বউদির বোন, আমাদের বাড়িতেই থাকে।

উনি বুঝি দাদা?

হ্যাঁ।

ডাক না ভাই বউদির বোনকে, একটু গল্প করি।

গ্রামের সুর আবার কানে আসিতেছে, জলের কলকল শব্দ যেন সৃষ্টির আদিমতম যুগের কলভাষ। মানুষ সব কিছুকে বাঁধিয়াছে, শুধু এই ভাষাটুকুকে বাঁধিয়া নষ্ট করিতে পারে নাই। গাঁয়ের মাঠে একলা বসিলে গম্ভীর মেঘ আর জ্বলজ্বলে তারারা যে সুরে কথা বলিত, তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। বনে

বনে জোনাকির ঝিকিমিকি নাই, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসের আলোই যেন নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়।

রাজাবাগান। আঁধার গভীর হইয়া আসিয়াছে। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সন্ধানী-আলো যেন অন্ধকারকে গাঢ়তর করিতেছে; তীব্র আলোকে অতি নিকটের লোকজন, স্টীমার, নৌকা, ঘাট, বয়া স্বপ্নলোকের জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে।

রেণু কথা কহিল, আকাশ বেশি সুন্দর, না জল বেশি সুন্দর ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আচ্ছা, জল দেখলেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় কেন বলতে পার?

সকলের হয় না।

যাদের হয় না, তাদের কথা আমি জানতে চাই না। তোমাকে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবুও বড্ড সুন্দর লাগছে কেন?

সে কথা বলিল না, রেণুর হাতখানি জোরে চাপিয়া ধরিল।

সমুদ্রের রাজকন্যার মন্ত্রপূত মণির স্পর্শে সমুদ্র-জলের মত মেঘাচ্ছন্ন পূর্ব্বাকাশ দুফাঁক হইতেই দ্বাদশীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। রেণু হঠাৎ ডাকিল, ললিত!

ললিত কাছেই ছিল, বলিল, কি দিদি?

চাঁদ দেখ্।

কিন্তু ভাইকে চাঁদ দেখাইতে গিয়া বোনের চক্ষু অশ্রু-সজল। রেণু তাহাকে ভয় করিতেছে ভাবিয়া সে তখন স্টীমারের অন্য

ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ললিত দেখে চাঁদ ; রেণু কালো মেঘ ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পায় না।

শোভা ততক্ষণে জমাইয়া লইয়াছে। যুবকটি একলা অতি নিকটে পায়চারি করিতে করিতে বক্রকটাক্ষে রেণুকে দেখিতেছে। নাম-ধাম, জাতি-গোত্র, বিদ্যা-বিদ্যালয়, শোভা সব কিছুর সন্ধান সংগ্রহ করিয়াছে। বড় মেয়েটির নাম বিমলা।

চোখের জল মুছিয়া রেণু শোভার কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল, বা! এরই মধ্যে যে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছিস শোভা!

বিমলা ও রেণুতে চোখোচোখি হয়।

রেণু বিমলার হাত ধরে। বিমলা বলে, তোমাকে কোথায় দেখেছি ভাই?

রেণু হাসিয়া বলে, স্বপ্নে। তুমি কুন্দনন্দিনী। হীরাকে চিনে রাখ।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফেরে, তখন নেশা একেবারে মাথায় চড়িয়াছে। মিথ্যা এ মায়াজাল। বাহির হইতে হইবে, নোঙর ছিঁড়িয়াছে।

ফিরিবার পথে যেন রেণু সঙ্গে ছিল না। কবিতা তখন রূপ ধরিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে। কিন্তু অসহ্য গরম।

দ্বিপ্রহর-রাত্রে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সামনের বাড়ির দেওয়ালটা আলোক-উদ্ভাসিত হইয়া যেন বলিল, তুমি কারাগারে বসিয়া আছ।

বৃষ্টি শুরু হইল। শান্ত পল্লীতে ডাকাত পড়িল যেন। চারিদিকে জানালা বন্ধ করার শব্দ, মিনিট দুই-তিনের জন্য আলো জ্বলিয়া নিবিয়া গেল।

ডেজি শ্মশান-শয়ন হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, বলিতেছে, আমার মাথায় আবরণ নাই। তোমার বক্ষে আমাকে আশ্রয় দাও। জনশূন্য মাঠে ডলি একা ভিজিতেছে, তাহারই খোঁজে বাহির হইয়া। রেণু কে?

কবিতা, কবিতা। সাদা পাতায় কালো অক্ষর একটির পর একটি কে গাঁথিয়া যায়, অদৃশ্য জগতের ইতিহাস রচনা করে! পাতার পর পাতা কালো হইতে থাকে।

চিতা-ধূমে সমাচ্ছন্ন, বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
পথিক দাঁড়াল নদীকূলে,
নয়ন মুদিয়া আসে ক্লান্তি ও তন্দ্রায়,
খুঁজিছে আশ্রয় তরুমূলে।

এপারে আঁধার আর ওপারে আঁধার,
মধ্যে বহে খরস্রোতা নদী,
কানে আসে, দূর হতে ডাকে বারম্বার
সীমাহীন দুস্তর জলধি।

আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে, বেগে বায়ু বহে,
অবিরল ঝরে বৃষ্টিধার,
তমোজাল ছিন্ন করে সুতীব্র আগ্রহে
শাণিত বিদ্যুৎ-তরবার।

নির্ব্বাপিত চিতাবহ্নি বৃষ্টি-জলধারে—
আকাশে ব্যাকুল বাহু দুটি,
প্রসারিত করাঙ্গুলি ডাকিয়া কাহারে
হতাশায় রুদ্ধ করে মুঠি।

পথিক দেখিল শুধু, স্তব্ধ নির্নিমেষ,
শুনিল কে করিছে আহ্বান,
"এস এস, আজো দ্বিধা হয় নাই শেষ,
প্রতীক্ষা করিছে মোর প্রাণ!"

বন হতে বনান্তরে ফিরিছে গুমরি
করুণ কাতর সেই স্বর,
কান পাতি যত শোনে, স্তব্ধ বিভাবরী,
বনে শুধু পাতার মর্ম্মর।

আকাশে অশান্ত মেঘ করিছে গর্জ্জন,
নদী বহে ছলছল সুরে।
জলে নিমজ্জিত চিতা, স্তম্ভিত পবন,
তবু স্বর মিলায় সুদূরে।

নদী-জলে বনে বনে, আকাশের মেঘে
'এস এস' জাগে হাহাকার—
চরণ চলে না, তবু অন্তর-আবেগে
স্পন্দিত নিরন্ধ্র অন্ধকার।

পুঞ্জীভূত সে স্পন্দনে আলোকের রেখা
কাঁপিল, ছিঁড়িল মায়াজাল—
নদী-তীরে দেখে পান্থ শীর্ণ পথ-লেখা—
দূর হয় বনের আড়াল।

পুনঃ হ'ল যাত্রা শুরু—

কলম কাঁপিয়া গেল, ছায়ামূর্ত্তির মত রেণু আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, আলুলায়িত কেশপাশ; অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ; শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদনের বাহিরে শীর্ণ হাত দুইখানি। সুবর্ণবলয় যেন স্বর্ণরেখা, তবু বিধবার বেশ। বনভূমির অন্ধকার মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

রেণুর চেতনা বিবশ। স্বপ্ন-সঞ্চারিণী লতা যেন।

কলম ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

রেণু, রেণু!

বাড়ির সকলে ঘুমাইয়াছে, সামনের বাড়ির জানালাও বন্ধ। তেতলার সেই বধূটি জাগিয়া নাই।

শনিপূজার দিন নেবুতলার স্মৃতি ফিরিয়া আসে।

নির্ব্বাক রেণু দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হয়। নদী আর সমুদ্র।

সাত

পথিকের যাত্রা স্থগিত আছে, কবিতার খাতা ধূলি-মলিন।

তাহার পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলে অবাক। পড়ে কত, হবে না?

রেণু শোভা কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। বেথুন স্কুল হইতে বেথুন কলেজে। ব্রাহ্ম গার্ল্‌স হইতে বিমলাও বেথুনে।

বিমলা বেশ মেয়ে, বড্ড সরল। বাড়ি বেশিদূর নয়, আলাপ জমিতেই আসা-যাওয়া শুরু হয়। দিদির কাছে থাকে, তাই একটু শঙ্কিত। পড়া-শোনায় সব চাইতে ভাল।

রেণু দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছে, হেমন্তের বিশীর্ণ নদী নয়, বসন্তের পুষ্পিত বনভূমি। প্রশংসমান দৃষ্টিতে সে দেখে, কিন্তু নেশা জমে না। অদ্ভুত পুরুষের মন! যাহা অসম্পূর্ণ—তাহার প্রতিই আকর্ষণ, পূর্ণ ও সার্থক যাহা—তাহা দূর।

মাঝরাত্রে নিদ্রাহীন রেণু শয্যায় জাগিয়া বসে, তাহারই পানে যে দুইটি ব্যাকুল বাহু এতকাল প্রসারিত হইয়া ছিল,

অন্ধকারে তাহা আর দেখিতে পায় না, ভয়ে শিহরিয়া উঠে। না না, অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব নয়।

বিমলা কবিতা লেখে, গল্পও। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তাহার যেন স্বভাব নয়। অত্যন্ত সহজভাবে সকল বিষয়ে আলোচনা করে। তাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। সে হইল বন্ধু।

বিমলা বলে, আপনাদের ধারণা এই যে, পুরুষ ভাঙে, মেয়ে গড়ে। আমার মনে হয়, কথাটা সত্যি নয়।

রেণু ভাবিয়া দেখে। বিমলা মেয়েই নয়। মেয়েরা প্রতিনিয়ত ব্যগ্র বাহু প্রসারণ করিয়া পুরুষকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, সেইখানেই তাহাদের সার্থকতা। যতক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই সংসারের লাভ।

বাহুবন্ধন সম্পূর্ণ না হইতেই অন্য দিকে টান পড়িয়াছে, দূরের আকর্ষণ নয়, অতি নিকটের। মোটা রক্ত-মাংসের।

মেয়ে-পুরুষের ভেদ সম্বন্ধে শোভা নির্ব্বিকার, তাহার পড়া আছে, মায়ের ফাই-ফরমাশ খাটিতে হয়, ভাইবোনদের শিক্ষার ভারও তাহার উপর।

তর্ক বেশিদূর চলে না, কথা বলার দিন চলিয়া যাইতেছে। গায়ে হাত পড়িলেই বিমলার চোখ বুজিয়া আসে।

রেণু দেখে, হাসে, কিন্তু কাঁটার মতন একটা কি বুকে বেঁধে।

স্থূল। সেই স্থূলই সূক্ষ্মকে জয় করিতে শুরু করিয়াছে। বয়সের ধর্ম্ম হয়তো।

রেণু কিছুই চাহে না। পাওয়ার, সার্থক হইবার ক্ষমতা তাহার আপনার মধ্যেই আছে। অন্ধকার রজনী তাহার কাছ হইতে কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। তবু সে হার মানিতেছে।

মোনা লিসার কথা মনে পড়ে। রেণু মুক্তির সঙ্গী, বন্ধনের নহে। রেণু হঠাৎ বলে, মোনা লিসার ছবিটা কোথায় রেখেছ? ওটা টাঙিয়ে রাখ।

চমক ভাঙে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। একটু হাসিয়া বিমলার দিকে চাহিয়া বলে, মেয়ে-পুরুষের তফাত জানতে চাচ্ছিলে? মেয়েরা অস্থির। কি তার প্রয়োজন, চিরটা জীবন শুধু তারই সন্ধান করে। নিষ্ফল সন্ধান।

বিমলা বলে, মিথ্যে কথা, সন্ধান করবার মত বস্তু কোথায়?

রেণু বলে, শোভা, চল্ ভাই, বটানিটা একটু দেখি গিয়ে।

রেণুর হাত ধরিয়া সে বলে, রাগ হ'ল? আচ্ছা, ছবিটা বের করছি।

ছবি টাঙানো শেষ না হইতেই রেণু শোভা চলিয়া যায়। বিমলা উঠি উঠি করিয়া উঠিতে পারে না।

ডলি আসিয়াছে। অনিল বাহিরের ঘরে বসিয়া।

ডলি হাসিয়া বলে, চিনতে পার?

সীমন্তের সিন্দূর-রেখা চিতাবহ্নির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমস্ত কৈশোর-জীবন স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিবাহের পূর্ব্বে সুসজ্জিতা ডলি তাহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। গাঁয়ের আকাশ তখন সানাইয়ের কান্নার সুরে মুখর ছিল। এবং ডেজি ছিল সত্য।

চেনা কঠিন। যে মেয়ে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, ঘরের স্মৃতি তাহাকে পীড়ন করে।

বলে, তুমি যে হঠাৎ এখানে?

মাকে দেখতে এলাম—কাকীমাকে।

ডেজি-ডলির গল্প রেণু তাহার মায়ের মুখে শুনিয়াছে, সে নিজে কখনও কিছু বলে নাই। ডলি তাহার কতখানি, আর কেহ না জানিলেও রেণু জানিয়াছে।

বিমলা স্থির আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া ডলিকে দেখে।

হঠাৎ ডলি বলে, নীচে যাও না, উনি হয়তো একলা ব'সে আছেন।

উনি? অনিলবাবু এসেছেন?

সে দ্রুত নীচে চলিয়া যায়।

একজন মরিয়াছে। বাকি তিনজন মুখামুখি বসিয়া গল্প করে।

রেণুর মনে যেখানটায় ফাঁক ছিল, ডলি তাহা ভরিয়া দেয়। সে প্রথম।

রেণুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ডলি বলে, সব মিথ্যে ভাই, নিজের মনটাকেই আজ পর্য্যন্ত যাচাই ক'রে উঠতে পারলাম না।

ক্ষুরধার তরবারি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। রেণু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। বলে, আমার ভয় করে দিদি।

মাকে কাঁদাইয়া স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ডলি চলিয়া যায়, কিন্তু আগুন ধরাইয়া যায়।

অনেকদিন পৃথিবীকে ভুলিয়াছিল, মূর্ত্তি ধরিয়া সে আপনার অস্তিত্বের খবর দিয়া গেল। কলেজ আর গড়ের মাঠেই পৃথিবী সম্পূর্ণ নয়, আরও আছে।

পড়া লইয়া পূরা দুই বৎসর। রেণু বিমলা ট্রেনের সঙ্গী যেন। অর্থহীন অনাবশ্যক আলাপ। কোথায় যাবেন? আপনাদের ওদিকে বৃষ্টি কেমন? ধান-চালের অবস্থা? দেখুন তো টিকিটটা ঠিক দিয়েছে কি না?

বিমলা রেণু আসে, দিনের পর যেমন রাত্রি আসে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। বিশেষ নজর দিবার মত করিয়া আসে না।

রেণু-ডলির চিঠি লেখালেখি চলে। রেণু লেখে, সে-মানুষকে দেখলে চিনতে পারবে না দিদি। বই ছাড়া সঙ্গী নেই। বাদলা-পোকার মত মাথা ঠুকেই মরছি!

ডলি প্রশ্ন করিয়া পাঠায়, আর বিমলা?

রেণু জবাব দেয়, তাকে বোঝা কঠিন। কবিতা-গল্প লেখা বন্ধ করেছে একেবারে। পরীক্ষায় এবার বোধ হয় ফার্স্ট হবে।

হইলও তাহাই। বিমলা ফার্স্ট; সেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—ইংরেজী অনার্সে। বয়স ছাব্বিশ হইয়া গিয়াছে, সার্ভিস একজামিনেশন দেওয়া চলিবে না।

পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মায়ের মৃত্যু হইল। সব চাইতে কাঁদিল রেণু।

ডলি লিখিল, দুই বৎসর আগে তোমাকে অন্নের জন্যে দেখেছিলাম। দেখতে ইচ্ছে করে। কিছু দিন এখানে এসে থাকবে?

অসম্ভব।

রেণুর বিবাহ ঠিক হইয়াছে। বিমলারও। শোভার বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিমলা বাঁকিয়া বসিয়াছে। সে বিবাহ করিবে না। লেখাপড়া লইয়াই থাকিবে।

বিমলা কথা বলে নাই। বলে নাই, আমার মাথায় হাত রাখ, আমাকে স্পর্শ কর।

নির্ব্বাক্ মরুভূমি।

শোভার বরের সঙ্গে গল্প করিবার অছিলায় রেণু মাঝরাত্রে আসিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙিতেই তাহার মনে হইল, ইহাই তো স্বাভাবিক, ইহার জন্য ভণিতার কিছু আবশ্যক নাই।

কিন্তু রেণু যেন কাঁদিতেছে। দুই হাতে মুখখানা বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলে, রেণু, তুমি কাঁদছ?

রেণু কত অসহায়! কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, আমি ডলিদি নই, বিমলাও নই। ওরা তপস্যা করতে পারে, আমি পারি না।

সে উঠিতে চায়, কিন্তু বুকে বন্যার স্রোত।

রেণু বলে, সব নাও, দেহ মন, অন্য কিছু ভাববার অবকাশ যেন না থাকে। নিজেকে সবল ভেবেছিলাম, দেখছি, সব চাইতে দুর্ব্বল আমি। তোমাকে ছাড়তে পারব না।

কিন্তু তোমার আত্মীয়—

তাদের কথা আমি জানি না, তোমার জোর নেই? কেড়ে নাও আমাকে।

এর পরে যখন—

তুমি ভবিষ্যৎ ভাব। রেণু উঠিয়া বসে। আমি যাই।

শুনে যাও রেণু।

রেণু এলাহাবাদে মাসীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, সেখানেই তাহার বিবাহ হইবে। বিমলা লাইব্রেরি শেষ করিতে ব্যস্ত।

একা।

সময় আসে, যখন দেহটাই মানুষের সব চাইতে বড় হইয়া উঠে।

গড়ের মাঠে বিমলা ইহার আভাস পায়। বিদ্যুতের আঘাত। বিমলা বলে, এর শেষ নেই। তুমিই হার মানবে।

অভিমান হয়। নেশা আর বিচারবুদ্ধি পরস্পরবিরোধী।

বলে, বিমলা, তুমি নিষ্ঠুর।

বিমলা হাসে, মনে মনে বলে, আমার কান্না তো তুমি দেখলে না!

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস। শোভা রেণু পড়া ছাড়িয়াছে। বিমলা বি.এ. ক্লাসে। রেণু এলাহাবাদ হইতে ফেরে নাই। সেখানেই স্বামীর ঘর। রেণুর বিবাহে ডলি গিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় নামে নাই।

রক্ত আর মাংস, এবং তাহারই বিকৃতি।

জনাবালি আর পরীকে মনে নাই, দ্বিপ্রহরে পাখীদের খেলা বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু মন উদাস।

ভাবে, ইহার শেষ দেখিব। বিমলার ভুল ভাঙিব। তার পর—

মোনা লিসার ছবি সার্থক হইয়াছে। অতি নিকটের ক্রূর হাসি, আর দিগন্তের ইঙ্গিত।

বিমলা রেণুকে লিখিয়াছে, ভাই, তুমি তো বিয়ে ক'রে আত্মরক্ষা করেছ, কিন্তু যে তোমার আত্মা, সে-ই নষ্ট হতে বসেছে।

অসহায় রেণু!

রেণুর কান্নার সঙ্গে মিশিয়া খবরটা ডলির কাছে পৌঁছায়।

ডেজিকে স্মরণ করিয়া এতদিন পরে ডলি কাঁদিতে বসে। ছোট্ট ডেজিই শুধু চিনিয়াছিল, আর সবাই ভুল করিয়াছে।

দেহটাও কম নয়।

সবাই দূরে থাকে। শোভা শুধু কাছে আসিয়া বলে, দাদা, তোমার শরীর দিনে দিনে কি হচ্ছে! তুমি বিয়ে কর।

কোনও উৎসাহ নাই। মুখে ম্লান হাসি। কথা না বলিলেই নয়, তাই বলে, পরীক্ষাটা—

ছাই পরীক্ষা, এমনই করলে তুমি বুঝি পাস করবে?

মেয়েদের বয়স কত সহজে বাড়িয়া যায়। সেই শুধু ছোট রহিয়া গেল।

নেশা কাটে, আবার ধরে। মদের বদলে কবিতা। বাপ-মায়ের কথা তুলিয়া মামীমা খোঁটা দেন। নেশা দ্বিগুণ হয়।

রেণু লিখিয়াছে, ভাই বিমলা, আমার আর উপায় নাই, তুমি রক্ষা কর। জানি, তুমি পারবে।

বিমলা ভাবে। সেও তো নিতান্ত অসহায়! মন অসম্ভব কিছু ঘটিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

বন্যার জল কে রোধ করিবে? বাঁধ বাঁধিয়া তাহার গতি হয়তো ফেরানো যায়, কিন্তু স্রোত বন্ধ হয় না।

রেণু স্বামীকে ভালবাসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখিলে ভয় হয়। বিশীর্ণ নদী এখন অন্তঃসলিলা।

গভীর নিশীথের নিঃশব্দ অভিসার মনে পড়ে, কৈশোরের স্বপ্ন। কত বিনিদ্র রজনী যাহার ধ্যানে কাটিয়াছে, যাহার বুকে তাহারই তপ্ত অশ্রু আজিও মুছিয়া যায় নাই, আকর্ষণ করিতে গিয়া সেই তাহাকে দূরে ঠেলিয়াছিল। রেণু এখন বুঝিতেছে, সে ভুল করিয়াছিল।

অসহ্য বেদনায় পীড়িত রেণুর মূর্চ্ছা শুরু হইল। মাথার যন্ত্রণায় অন্য সময় সে মুহ্যমান থাকে।

শেষে আর পারিল না। স্বামীকে সমস্ত বলিয়া ফেলিল, বলিল, সে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইবার নহে ভাবিয়াছিল, ভুলিতে পারিবে, কিন্তু ক্ষত তাহার অক্ষয় হইয়া রহিল। স্বামীর পাশে শুইয়া স্মৃতির সেবা করিতে সে আর পারে না। স্বামী তাহাকে ক্ষমা করুন, সে শুধু কলিকাতায় গিয়া একবার তাহাকে দেখিতে চায়।

নষ্টনীড়।

স্বামী দুই পুরুষ ধরিয়া প্রবাসী। বাংলার মেয়ে আজিও হেঁয়ালি রহিয়া গেল। ব্যথিত কণ্ঠে বলে, চল।

কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রেণু বলে, তুমি রাগ করবে না?

তাহার হাত দুইখানি মুঠির মধ্যে লইয়া স্বামী বলে, না।

হাওড়া স্টেশনে নামিয়াই রেণু প্রশ্ন করে, ফেরবার ট্রেন কখন? অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন! মুখের সমস্ত রক্ত চোখে আশ্রয় লইয়াছে। কখন চুল খুলিয়াছিল, আর বাঁধা হয় নাই। ইহার চাইতে কান্না ভাল।

স্বামী বলে, কেন?

আমি যাব না, চল, ফিরে যাই।

তা হয় না, তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার আছে।

না না, তার চাইতে পুরী চল, আমাকে বাঁচাও।

আবার আসতে চাইবে না?

না। কেন, পুরীতে সমুদ্র নেই?

স্বামী মনে মনে বলে, আছে, কিন্তু কলিকাতার সমুদ্র তাহার চাইতেও বড় বোধ হয়।

গঙ্গার পোল পার হওয়া হয় না।

এপারে আঁধার আর ওপারে আঁধার,
মধ্যে বহে খরস্রোতা নদী,
কানে আসে, দূর হতে ডাকে বারম্বার
সীমাহীন দুস্তর জলধি।

মিথ্যা কথা, সাগর দুস্তরও নয়, সীমাহীনও নয়। নদীটাই বড়। তিন দিনে রেণু সাগরকে চিনিয়া লইল। মোহ টুটিল।

তারপর মনকে ছিঁড়িয়া দলিয়া ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিল। ঘন ঘন মূর্চ্ছা।

স্বামী মুখে কথা বলে না। তাহার অন্তর কাঁদে।

বলে, তোমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাই।

উত্তেজিত রেণু সবলে তাহার পা চাপিয়া ধরে। না না, কলকাতা নয়, এলাহাবাদ চল। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

এত বড় স্বীকারোক্তি শুনিয়াও মন ব্যথিত হয়।

কল্লোলিত সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া রেণু সবুজ জল দেখে না। দেখে, তটের বুকে তরঙ্গের নিষ্ফল আঘাত। ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বালুবেলায় সমুদ্রের বুকের ছাপ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়।

মনে পড়ে—

রথখানা গেল ভেঙে, চড়ি চতুর্দ্দোলে
উলুধ্বনি উল্লাস-কল্লোলে
দুজনে করিনু যাত্রা, অজানিত পথ,
সুমুখে পড়িয়া আছে অন্ধ ভবিষ্যৎ।

রথখানা ভাঙিয়াছে, অন্ধকারে চতুর্দ্দোলে আসিয়া বসিয়াছে আর একজন।

এবার পথ অজানিত নয়।

আট

মামীমা পথ দেখিতে বলিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ নাই, পরীক্ষার এখনও কিছুদিন বাকি আছে। ততদিন পর্য্যন্ত সময় লইয়াছে।

শোভা বলে, দাদা, আমার বাড়ি চল।

শোভার শ্বশুরবাড়ি কলিকাতাতেই। বড়লোকের ঘর। বড় একটা আসিতে পায় না। দাদার দিকে মন পড়িয়া থাকে।

স বলে, মিথ্যে চেষ্টা বোন। ভূমিষ্ঠ যেদিন হয়েছি, সেদিন থেকেই আমি আশ্রয়হীন ; আশ্রয় যেদিন জুটবে, সেদিন আমার মৃত্যু।

তবু শোভার মন মানে না।

রেণুকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ব্যবধান বাড়িতেছে। কলিকাতায় মায়ের চিতা যেখানে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার পাশে যেন আরও দুইটি চিতা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে—গ্রামের শ্মশানের। খেয়াল হইলেই সেখানে গিয়া বসে। চুলের খামটা পর্য্যন্ত আর খুঁজিয়া পায় নাই।

ছবিখানা দেওয়ালে নাই। রেণু লইয়া থাকিবে। কবিতার খাতাগুলি কেহ লইলে ভাল হইত।

কাহাদিগকে লইয়া আপনাকে নিঃস্ব নিঃশেষ করিতেছে সে! চোখ মেলিয়া কখনও কি তাহাদের দেখিয়াছে? মানুষের সব

চাইতে যাহা বড় পরিচয়, সম্ভবত মানুষের ধর্ম্ম যাহা—স্বপ্ন দেখা, তাহাই তাহাদের নাই। তাহারা ভাগ্যহীনা।

বিকৃত বীভৎসতা তাহাদের নয়। তাহারা তো দর্পণ মাত্র। যাহাদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহারা স্বতন্ত্র জীব ; আজ বাহিরে সেই জীবদের সঙ্গেই সে এক হইয়া গিয়াছে।

লজ্জা করিবে কাহার কাছে? ডলি: স্বামীর সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সে হয়তো সার্থক হইয়াছে। কাঁচা রঙ ধুইয়া-মুছিয়া নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছে।

রেণু? তাহার অভিমানটাই বড় হইয়া রহিল।

বিমলা? সে তো বন্ধু!

ডেজি? খেলা বড় সময়ে শেষ হইয়াছে, তাই নামটা আজিও স্বপ্ন রহিয়া গেল। বাবা তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। মা তো পরপারেও অন্ধ।

মানুষকে এ ভাবে চুলচেরা বিচার করিবার অধিকার কে দিয়াছে? সে তো কলের পুতুল নয়! কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তাহা ঠিক করিয়া দিবে কে? অন্যায় আর ন্যায়, স্থান আর কালের উপর নির্ভর করে, শুধু ব্যবহারের উপর নয়।

দেহ চাহিয়াছিল, কিন্তু শুচিতাকে বাদ দিয়া নহে। প্রত্যেক অণু-পরমাণুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে কামনা বিকারমাত্র। বিকারের ঘোর কাটিয়াছে। এখন একটা অস্বস্তিকর অশুচিবোধ।

যাহাদের লইয়া কারবার, তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা বলে, এ একটা ঢং ; কাদায় বসিয়া পদ্মের স্বপ্ন দেখা। মানুষে তাহাও পারে, কিন্তু সে তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। দেওয়া আর নেওয়া—এইটুকুই তাহাদের জীবনের ইতিহাস। হয়তো গোড়ায় ঠকিয়াছে। এখন স্মরণ নাই।

তাই তাহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে, ভালবাসে না।

সে চায়ও না। দেহ চাহিয়াছিল। দেহ দিতে কেহ ইতস্তত করে নাই, তাই আজিও গ্লানি কাটিতেছে না।

পরীক্ষা তখনও হয় নাই, বিমলারও নয়।

কয়েকদিনের পঙ্ক-স্নানের পর বিছানায় উপুড় হইয়া খাতা লইয়া লিখিতে শুরু করিয়াছিল।

অবসন্ন দ্বিপ্রহর। নিতান্ত একা। করুণা-সুধীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, দাদা বড় ডার্টি। শোভা ডার্টি বলিত না। লেখাটা কাহাকেও শোনাইলে আনন্দ হইত। রেণু—?

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ
বিশ্ব-হলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নবজন্ম লভে অকস্মাৎ
শুষ্ক তৃণদল।
নিখিলের পুষ্প যত চিত্তে মোর উঠে বিকশিয়া,
অনন্ত আনন্দ-রস ধরা-বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া ;
কলহ ডুবিয়া যায়—সত্য শিব বিরাজে সুন্দর,—

বিরহ পলায় দূরে, মিলনেতে বিশ্বচরাচর
শোভে মনোহর।
শুধু শান্তি অবিরাম নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি।

মথিয়া বিশ্বের বিষ সুধা যত আহরণ করি—
বিশ্ব করে পান,
কল্পনা-মৃণাল-বৃন্তে চিত্তপদ্ম রাখি নিত্য ধরি ;
সঙ্গীত মহান
মনোবীণা হতে মোর উচ্ছ্বসিত হয় শূন্যমাঝে,
কর্ম্মভারাতুর যবে কর্ণে মোর সে সঙ্গীত বাজে।
চমকিয়া জাগি আমি পান করি নিঃস্যন্দিনী ধারা,
কে আনিল স্বর্গজ্যোতি ! চারিদিকে অন্ধকার কারা,
সুপ্তি—দীপ্তি-হারা !
ক্ষণে জাগ, নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নসম মিলাও চকিতে
ক্ষুব্ধ করি চিতে।

কঠিন উপলখণ্ড পদে পদে বাধা হয় পথে,
ক্ষণে ভুলি দিক—
ধূলায় কর্দ্দমে হই নিষ্পেষিত মহাকাল-রথে,
দুর্ব্বল পথিক !
আবরণ টুটে যায় প্রকটিত রন্ধ্রমুখ যত—
ন্যুব্জ হয়ে পথ চলি সংসারের গুরুভার-নত।
হিংসা দ্বেষ অপমান চারিদিকে বহ্নিজ্বালা জ্বলে—

তুমি কোথা গুপ্ত রহ হৃদয়ের গোপন অতলে—
কোন্ মন্ত্রবলে !
বেদনা-জালায় চিত্ত ছিন্নভিন্ন শ্রান্ত ব্যথাতুর
আঘাতে নিষ্ঠুর ।

বিমলা হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠে, এখনও তৃপ্তি হ'ল না তোমার ?

চমকিয়া উঠে। রেণু নয়। ভঙ্গীটা তাহার। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি টানিয়া বলে, একটা কবিতা লিখেছি, শুনবে ? তুমি নিজে তো আর কিছু লেখ না।

বিমলার ব্যাকুল দৃষ্টি। বলে, না বলতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে ক্ষমতা নেই। পড়।

দীর্ঘ কবিতা। ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে বিহ্বলতায় পরিণত হয়, কঠিন মন গলিয়া যায়, দেহ অবশ।

এই লুকাচুরি খেলা, এও ভাল বস্তুর জগতে,
স্বপ্ন অবাস্তব
যত ক্ষণিকের হোক, এই সত্য মিথ্যাময় পথে—
আলোক দুর্লভ !
পাষাণ-পঞ্জর টুটি ক্ষণিকের এই উৎসধার,
কারাগারে রন্ধ্র-পথে এই স্পর্শ আলোক-রেখার,
ঘোর বিভীষিকা মাঝে নন্দনের আনন্দের ছবি—
ক্লেদপঙ্ক মাঝে এই সুবাসিত কুসুম-সুরভি—
ধন্য মানে কবি !

যেথা থাক, পাই যেন রহি রহি রহস্য-আভাস,
জীবন-নিশ্বাস।

বিমলা সহসা বলে, একটা কথা অনেকদিন থেকে ভাবছি। পরীক্ষা চুকে গেলে বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে দিলে না। আমাকে নিয়ে তোমার কোনও কাজ হবে? আমাকে নেবে? আমি আত্মসমর্পণ করছি।

রেণুও একদা নিশীথে ঠিক এমনই ভাবে বলিয়াছিল, নাও, দেহ মন—সব নাও।

সে লইতে পারে নাই।

ডলি তাহারই গানের সুরে সুর মিলাইয়া মনে মনে বলিয়াছিল—

তুমি চল, আমি চলি,
মুখে কথা নেই বা বলি,
পার হব কি মরব ডুবে
একই খেয়া-ঘাটে—

সে খবরও তাহার অজানা।

কথাটা উল্টো হ'ল বিমলা। তুমি ঠকবে।

লাভ-লোকসানের কথা নয়, আমার আর সহ্য হয় না।

বেশ, দূরে স'রে যাচ্ছি।

তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া শান্ত সহজ সুরে বিমলা বলে, তার চাইতে আরও কাছে এস। সেইটেই সহজ।

তার পর ?

বিমলা ললাটে হস্ত-স্পর্শ করে। হাসিয়া বিমলার একটি হাত ডান হাতের মুঠির মধ্যে লইয়া সে বলে, তার পর—

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।"

কি বল ? তোমার এ আত্মত্যাগ কেন বিমলা ?

তাই ভাবতাম বটে, দেখছি, সেটা মিথ্যে। আত্মত্যাগ করেছি এতকাল, আর পারি না। তোমার জন্যে আমি আসি নি, নিজের জন্যেই এসেছি।

যদি মোহ ঘোচে—তোমার কিংবা আমার ?

তোমার ঘুচলে কাঁদতে বসব না, আমার ঘুচবে না, কারণ আমার মোহ নেই।

কি দেবে আমাকে ?

দেহ। তোমার ভোগের নেশা মেটাতে পারব বোধ হয়।

শুধু দেহটাই তো ভোগের উপচার নয় বিমলা।

সব চাইতে বড় উপকরণ নিশ্চয়ই।

কিন্তু পাওয়া কঠিন। মন আর দেহের সীমারেখা কোথায় ? একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার অস্তিত্ব নেই।

বিমলা হাসে। নেশা তবে কাটিতেছে। রাজপুত্রের ‘পক্ষীরাজ’ এখনও মরে নাই।

•তুমি তাই ভেবেছিলে ব’লেই দেহ নিয়ে এসেছি।

বিমলার পরীক্ষার বেশি বাকি নাই। সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইল। সে-ও।

শুকনা পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। কিশলয়ের অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। শেষরাত্রির শীত আর মধ্যদিনের খরদাহ। বসন্ত-কাল। কুরচি আর সোঁদাল ফুল।

গ্রাম তেমনই আছে। মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহাকে আর সেখানে ধরে না, কিন্তু বিমলা আত্মহারা।

মাগো, একটা ধেড়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে, লজ্জা নেই! এই ছেলেরই এত প্রশংসা! ছি!

বিমলা দমে না। সব চাইতে যে মুখরা, তাহার হাত ধরিয়া বলে, স্বপ্ন দেখেছি দিদি, পূর্ব্বজন্মে এখানেই আমার ঘর ছিল। তাই দেখতে এলাম।

নেকা!

বিয়ে হয়েছে?

না হ’লেই বা ক্ষতি কি?

সে কি গো? গ্রামে ঢি-ঢি পড়িয়া যায়। খুড়া মহাশয়ের সম্পত্তির লোভ। খুড়ীমা তবু চুপ করিয়া থাকিতে পারে না,

বলে, বাপের বাড়ি চললাম আমি। শেষে কি একঘরে হব? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

কিন্তু সহিয়া যায়। কলিকাতায় খবর পৌঁছে। দিদি বিমলাকে লেখে, তোমার মুখ যেন আর দেখতে না হয়। ভগিনী-পতির লোভ ছিল। সে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জাইতে থাকে, বলে, জেলে দেব।

কিন্তু হাঙ্গামার ভয়।

শোভা রেণুকে লিখিয়াছে, বিমলা দাদার সঙ্গে গাঁয়ে গিয়ে সেখানেই বাস করছে। নিন্দে হ'লেও মন্দের ভাল।

পড়িয়া রেণুর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, নিন্দা আর বিদ্রূপই কাম্য বলিয়া মনে হয়।

মনে পড়ে—

দূরে গ্রাম-শ্মশানের কুক্কুর শৃগাল
করিছে চীৎকার, যেন বৃদ্ধ মহাকাল
আতঙ্কে রয়েছে স্তব্ধ—

যাহার আসিবার কথা ছিল, সে আসিল না। পথের বাঁশী তবু বাজিয়াছে।

সংসার!

শীতান্তের বিশীর্ণ নদী। কালো হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, আর ছেঁড়া কাঁথা। গ্রামের শ্মশান।

বিমলা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখে। বলে, আর বাবার? আন্দাজে জায়গাটা ঠিক করে।

ডেজিকে মনে করিয়া বিমলা বলে, এখানে ম'রেও সুখ আছে। ডলিদির সঙ্গে এখানটায় ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, না?

সেই ফলসাগাছই বটে। নূতন পাতা গজাইতেছে।

বিমলাকে ভ্রষ্টা মনে করিয়া গ্রামের যুবকেরা লোলুপ। ও একাই ভোগ করিবে কেন? বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপের আলোচনাও সরস। ঘোষবংশে এমন একটা অকালকুষ্মাণ্ড জন্মাইল! দুই-কান-কাটা। মেয়েটি দেখিতে বেশ। কিন্তু একেবারে পটের বিবি, সেমিজ খোলে না। খুড়া মহাশয়কেও বহু দুঃখে ভাইপোর বিরুদ্ধে লাগিতে হয়। সমাজ ধর্ম্ম আগে, আত্মীয়-পরিজন পরে। আসলে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। শ্যালকের আসিবার কথা ছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাহার বিদ্যাধরী ঘর দুইখানা দখল করিয়া আছে! হউক না তাহারই ঘর, তবু তো একটু বিবেচনা থাকা চাই!

সে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বিমলা নির্ব্বিকার। বলে, সকল অপমানের অতীত আমি। তুমি আমাকে অমৃত দিয়েছ, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার জন্যে দুঃখ হয়।

বিমলা অন্তঃসত্ত্বা।

বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। বাহির হইবার উপায় নাই। কর্দ্দম-পিচ্ছিল পথ। কলিকাতায় ইট-কাঠ-পাথরের রাজ্যে

আকাশ-জোড়া মেঘ, অবিরল জলধার, এবং ঝড়ের ঝাপটা বিরহী যক্ষের স্বপ্ন সৃজন করে,—কোথাও বা ঘন বনশ্রেণী, নদীজলে মেঘের মায়া, তড়াগ পল্বল সরোবরে রাজহংসের কেলিকাকলী, কোথাও বা ভবন-প্রাঙ্গণ কেকারবমুখর, অন্তঃপুর কেতকী-কুসুম-সুরভিত।

কিন্তু বনভূমি যেখানে সত্য সত্যই ঘন, সরোবরে যেখানে কাকচক্ষু জল, সেখানেই বর্ষা স্বপ্ন সৃজন করিল না। সে হতাশ হইল। বিমলার কাছে লজ্জার অন্ত নাই।

বিমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে ঘরের দাওয়ায় দুইজনে মুখামুখি বসিয়া থাকে। আকাশে মেঘ থমথম করে। বিদ্যুৎ ঝলকিতে থাকে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস আর অবিশ্রান্ত বারিপাত।

তালের টোকা মাথায় রাস্তায় লোক চলিতেছে, দূরে বনশ্রেণী ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। কাছের গাছগুলির মাথায় মাথায় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলো। লাল কাঁকর-বিছানো পথের বহু স্থল ভাঙিয়া গিয়া এধার হইতে ওধারে জল ছুটিতেছে। পথিকের পায়ে লাগিয়া জল ছপছপ করিয়া উঠিতেছে।

অনেকদিন আগের লেখা একটা কবিতা মনে পড়িল—

বিরহ-তাপে তাপিত বুকে লাগিছে জলকণা,
জলের ধারা তুলিছে সাড়া সারাটি দেহে মম,

মাটির বাসে দূরের আশে হতেছি আনমনা,
আঁধারে ঘন ছবিটি তব জাগিছে প্রিয়তম।

তুমিও সখি, জানালা-ধারে নয়নে ঘুম নাহি,
বাদল নিশি বিরহ দুখে করেছে দিশাহারা,
ব্যাকুল বুকে পাষাণ-ভার কাজল মেঘে চাহি,
পরশ মম চাহিয়া হাতে ধরিছ জলধারা।

উতলা বায়ু এলানো, চুল বাহিরে ল'য়ে যায়,
ভিজিয়া গেল নিচোল বাস, তাপিত দেহ তবু—

বিমলা বলে, চল না, একটু ভিজি গিয়ে!

মনে পড়িল, একদিন খোলা মোটরে বিমলাকে লইয়া চৌরঙ্গী দিয়া টালিগঞ্জের দিকে যাইতে ঠিক মাথার উপরে মেঘাবৃত চাঁদ দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছিল, স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। ছবিটা বিমলার হয়তো মনে নাই। কিন্তু তাহার স্পষ্ট মনে আছে।

চাঁদ মেঘে ঢাকা, তবু দেখা যাইতেছিল। তাহার চারিপাশে আলোক-বলয়। সেই আলোক-মুকুটকে কেন্দ্র করিয়া সারি সারি স্তম্ভের মত ঘোর কালো মেঘ চারিদিকে নামিয়া পড়িয়াছে। সাধারণ দৃশ্য হয়তো। কিন্তু মোটর বড় গির্জ্জা পার হইতেই নগরীর উজ্জ্বল আলোক হঠাৎ স্তিমিত বোধ হইল। অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য। পশ্চিমে বহুদূরবিস্তৃত পোড়া-বাজারের মাঠ—যেন

নিস্তরঙ্গ কালো নদীজল। হাসপাতালের বাড়ি এবং গাছগুলি অস্পষ্ট—নদীপারের আবছা বন যেন। মধ্যে মধ্যে নারিকেল-গাছগুলির চূড়া আকাশের মেঘের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকের স্বপ্ন। এলগিন রোড পার হইতেই স্বপ্ন টুটিয়া গেল। মনে পড়িল, মোহাচ্ছন্ন বিমলা হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিল, চল, মাঠে নামিয়া পড়ি।

আজও সে জলে ভিজিতে চাহিতেছে।

বিমলাকে একদিন একা পাইয়া গ্রামের দুইজন যুবক অপমান করিল। কুৎসিত নিষ্ঠুর ইঙ্গিত। বিমলা গোপন করে, তবু সে জানিতে পারে।

বলে, বিমল, চল, এখানে আমাদের ঠাঁই নেই।

বিমলা বলে, তোমার মিথ্যা ভয়। তুমি এখানে জন্মাও নি? এখানকার শ্মশানে ডেজি আশ্রয় পায় নি?

বিমলা গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভাবিতেছে।

সে চুপ করিয়া থাকে।

বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। উৎসুক বিমলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সে আরও নিরাশ্রয়। খুড়ীমা বাপের বাড়ি গিয়াছে। ডলির মা দুই-একদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু নিন্দার ভয়ে আর আসেন না।

পথে বাহির হইবার উপায় নাই। বিমলা বাড়িতে একা থাকিবে।

বিমলা পীড়িত হইল। কিন্তু অক্ষয় তাহার মুখের হাসি। বলে, তুমি রান্না করতে পারবে? তার চাইতে রেণুকে খবর দাও, আমার অসুখ শুনলেই সে আসবে।

অসম্ভব। রেণু তাহার কে?

রেণু তাহার কে?—এ প্রশ্নের জবাব কে দিবে? নিস্তব্ধ রজনী, সুদূর প্রবাসে যে একা জাগিয়া কাটায়, সে তাহার কেউ নয়!

স্বামীর সেবা করিয়া রেণু সার্থক হইতেছে।

বিমলা এত কাছে, তবু একা। পীড়িত বিমলাকে ফেলিয়াই মন যাত্রা করে। তাহার চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বিমলা শিহরিয়া উঠে। নদীস্রোতকে বন্ধন করার চেষ্টা বুঝি নিষ্ফল হয়!

দেহ আটক পড়িয়াছে!

শোভা খবর পায়, কিন্তু সে নিরুপায়। শাশুড়ীর অসুখ, এখন-তখন অবস্থা। সে-ই রেণুকে খবর দেয়।

রেণু যেন ইহারই প্রতীক্ষায় ছিল। স্বামীকে চিঠি দেখাইয়া বলে, আমি যাব।

স্বামী বলে, বেশ, চল।

সীতারামপুর পার হইয়াই বাংলা দেশ। শীতের রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে। কিন্তু রেণুর চোখে জল।

মেল-গাড়িও এত আস্তে চলে ?

নিজের পৈতৃক ভিটায় আশ্রয় পাইয়াও যে নিরাশ্রয়, তাহার কিন্তু সবুর সহিল না। চৈতন্যহীন বিমলাকে গরুর গাড়িতে তুলিয়া ভরা শীতে সে বাহির হইয়া পড়িল।

আর একদিন মায়ের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল, তখন বিদায়ের আড়ম্বর ছিল। আজ সব রিক্ত—মাঠ রিক্ত, নদী শুষ্ক, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে।

সেই ফলসা-তলা, সেই শ্মশান-ঘাট। শ্মশানের হাঁড়িগুলি মাথা উঁচু করিয়া ডাকিল না।

হারু অনেকদিন মরিয়াছে। মনে পড়িল—

কারো দোষ নয় মা তারা,
আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি।

তাহার সন্তানের জননী আজ তাহার সহযাত্রী, সংজ্ঞাহীন। তাহার মর্য্যাদা কেহ রাখিল না। তাহার সিঁথিতে সিঁদুর নাই।

খুড়া মহাশয় শুধু বউমাকে সাবধানে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণী ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া হয়তো এতক্ষণ বাপের বাড়ি হইতে রওনা হইয়াছে।

স্টেশন।

তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রা। তাহারও টিকিট কিনিতে হয়।

ট্রেন ছাড়িয়া দিতেই বিমলার চৈতন্য হয়। পাণ্ডুর আকাশ, আর অতি নিকটের খেজুরগাছের ঝাঁকড়া মাথা দেখিতে পায়। প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছি?

তাহার কোলে বিমলার মাথা। চুলের জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বিমলার উত্তপ্ত কপালে তাহার শীর্ণ হাতখানি রাখে, কথা বলে না।

বিমলা বোঝে, বলে, ওই শ্মশানটার ওপর আমার লোভ ছিল। যাকগে।

দুইদিন না যাইতেই গ্রামে আব দুইজনের আবির্ভাব হয়। এবার মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর আছে, কিন্তু চোখে জল।

যে গাড়িতে আসিয়াছিল, সেই গাড়িতেই ফিরিয়া যায়। দেখে, শুধু শ্মশান।

স্টেশন। টিকিট-মাস্টার।

একটি মেয়েকে নিয়ে একজন ভদ্রলোক দুদিন আগে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের মুখে হাসি। ভিক্টোরিয়া ক্রসের লাইফ'স শপ উইণ্ডো হাতে। ইলোপ্‌মেণ্ট নিশ্চয়ই।

কোথাকার টিকিট কিনেছিলেন বলতে পারেন?

টিকিট-মাস্টার খাতা খুলিয়া সন্ধান করিতে থাকেন।

কলকাতা নয়?

না না, আপ-এ গেলেন। এই যে, আসানসোল।

টিকিট-মাস্টার দিন কয়েক তন্নতন্ন করিয়া দৈনিক বসুমতী পড়েন।

সন্ধান মেলে না। আসানসোলে কেহ আসে নাই।

আবার এলাহাবাদ।

শান্ত রেণু। কঙ্কাল।

নয়

ডলি।

ডেজির দিদি ডলি নয়, স্বামীর স্ত্রী ডলি।

পরস্পরকে নাকি বুঝিতে পারিয়াছে। স্বামী খুশি। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি করিলেও ভাগ্যবলে এমন স্ত্রীলাভ হয়।

বড়মা আসার পর হইতে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শাশুড়ীর যত্নের অবধি নাই।

রেণু আর চিঠি লেখে না। সেই রেণু মরিয়াছে।

মা গ্রামের খবর দেন। কাহার বিবাহ হইল, কাহার ছেলে হইল, অনেক কথা সে।

ঘোষেদের ছেলের কীর্ত্তির খবর যথাসময়ে ডলি পাইল। স্বামীর কাছে কিছু লুকায় না, কিন্তু এই চিঠিখানি ডলি গোপন করিল।

গোপন করিবার কারণ ছিল। ডলি কি কখনও কিছু প্রকাশ করিয়াছে? ডলি রেণু নয়।

রেণু মরুভূমি। এত রিক্ত, এত নিরাভরণ যে, বালুবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহজেই জল বাহির হইয়া পড়ে।

কিন্তু ডলি শ্যামল বনভূমি। বাহিরে পরিপূর্ণ। ভিতরের খবর রাখিবার প্রয়োজন নাই। মাটির স্তর, বালুর স্তর পার হইয়া পাথর হয়তো আছে, কিন্তু স্তর ভেদ করা সহজ নয়।

সেই ছোট বুদ্ধমূর্ত্তিটিই ডলির দেবতা। স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া গলায় আঁচল দিয়া ডলি দেবতার পূজায় বসে। শাশুড়ী হাসেন। পাগলী বউ, কালী গেল, দুর্গা গেল, শিব গেল, তবু দেবতা বটে, নইলে মূর্ত্তি কেন?

দেবতার ইতিহাস ডলি বেশি জানে না। যতটুকু জানে, তাহাই তাহার যথেষ্ট।

রাজপুত্র। পরিপূর্ণ ভোগের মধ্যেই একদা সংসারের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত সন্তানকে বুকে লইয়া স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সে ঘুম হয়তো আজিও ভাঙে নাই।

স্ত্রীর নাম ছিল গোপা, পুত্রের নাম রাহুল। তাহারা কোথায়, কেহ জানে না।

কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি লইয়া আজিও সংসারকে বরাভয় দিতেছেন।

ঘোষেদের ছেলের কীর্ত্তির কথা মা জানিবেন কেমন করিয়া? সে কীর্ত্তি রাজপুত্রের কীর্ত্তির চাইতে ছোট নয়।

মায়ের মৃত্যু ডলি সহিয়াছিল, কিন্তু বিমলার অসুখের সংবাদ তাহাকে পাগল করিয়া দিল।

রেণু বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিল। ডলি স্বামীর সেবা করিতে লাগিল।

ছোট্ট নেবুগাছটাই অলক্ষ্যে তাহার বুকের ভিতর শিকড় চালাইয়াছে। অন্ধকারে আলোক-স্পন্দন আজিও থামে নাই।

ডলির সংসারে ডেজির অপমান হইতেছে। হয়তো এসব মিথ্যাচার। ডেজি মিথ্যার আশ্রয় লইত না। কাঁঠালগাছ-তলার মাটিতে সে যখন চোখের জল ফেলিতেছিল, তখনও ডেজি তাহাকে ডাকিয়াছিল। সেই 'দিদি' ডাক ক্রমশ চাপা পড়িতেছে।

ডেজি যাহা হাতের মুঠায় পাইয়াও ত্যাগ করিয়া গেল, তপস্যা করিয়াও ডলি যাহা পাইল না, শঙ্কিত অভিমানাহত রেণু লোলুপ হইয়াও যাহা গ্রহণ করিতে পারিল না, অমৃত-মন্থন-করা

সেই বিষ বিমলা স্বেচ্ছায় পান করিয়াছে। বিমলা নীলকণ্ঠ। তাহার গর্ভে চারিজনের সন্তান।

ডলির নিঃসঙ্গ দেবতা সঙ্গী পাইয়াছে। ছোট্ট মূর্তিটার পাশে আর একজনের অদৃশ্য মূর্ত্তি।

ডলির ছেলে হইবে। বাড়িতে উৎসব।

মিথ্যা কথা। ডলির ছেলে নয়। তাহার সন্তান কোথায়, কেহ জানে না। বিমলা এক বৎসর কাল নিরুদ্দেশ।

ছেলে।

শাশুড়ী বলেন, শিবরাত্রির সলতে, আমার সাত রাজার ধন ।নিক।

তিনি 'মানিক' বলিয়াই ডাকেন।

স্বামী রামায়ণ মহাভারত অভিধান খুলিয়া নাম বাছিতে ব্যস্ত।

প্রবীর?

ডলির পছন্দ নয়।

ইন্দ্রজিৎ?

না।

শঙ্কর, পিনাকী?

না।

তবে ?

বলছি।

ডলি পূজা করিতে বসে।

পূজায় মন বসে না।

গরুর গাড়িতে বিমলা অচৈতন্য, তাহার গর্ভে সন্তান। মন্থর গরুর গাড়ি চলিয়াছে, রাজপুত্র পাশে পাশে পথ চলিতেছে। গ্রাম ছাড়াইয়া, শ্মশান অতিক্রম করিয়া নদী। নদীপারে লাল কাঁকর-বিছানো পথ দিগন্তে মিশিয়াছে। মিথ্যা কথা, স্টেশনে সে যায় নাই। সেই লাল পথ ধরিয়া গরুর গাড়ির পাশে পাশে সে চলিয়াছে, পাহাড় পর্ব্বত নদী বন অতিক্রম করিয়া। রোদ উঠিয়াছে, বর্ষা নামিয়াছে। পথ চলার বিরাম নাই। অচৈতন্য বিমলা গাড়িতে তেমনই ভাবে পড়িয়া। তাহার গর্ভের সন্তান আজিও পৃথিবীর আশ্রয় পাইল না।

স্বামী অস্থির। কি নাম ঠিক করলে ?

পূজার কাপড় তখনও ছাড়া হয় নাই। শান্ত ডলি বলে, অজয়।

স্বামীর চমক ভাঙে। ঘোষেদের সেই কীর্ত্তিমান ছেলের নাম।

সমাপ্ত